তারিখ-ই-শেরশাহী

মূল ঃ আব্বাস খান শেরওয়ানী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তারিখ-ই-শেরশাহী

মূল ঃ আব্বাস খান শেরওয়ানী

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তারিখ-ই-শেরশাহী

মূল : আব্বাস খান শেরওয়ানী

অনুবাদ : মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

ই.ফা. অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ : ১২

ই.ফা. গ্রন্থাগার : ৯৫৪.০২

ই.ফা. প্রকাশনা : ১৩৩৩

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৮৬

যিলহজ্জ ১৪০৭

ভাদ্র ১৩৯৩

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ঢাকা-২

প্রচ্ছদ অংকনে

আবদুর রোউফ সরকার

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

মূল্য : বাইশ টাকা মাত্র

TARIKH-E-SHER SHAHI (History of Sher Shah) written by Abbas Khan Sherwani translated by Mohammad Ali Chowdhury in Bangali and Published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. October, 1986

Price in Tk. : 22·00

U.S. Dollar : 1·00

আমাদের কথা

তারীখ-ই-শেরশাহী-এর মূল লেখক প্রখ্যাত ইতিহাস-বেত্তা আব্বাস খান শেরওয়ানী। এ পুস্তকটি ষোড়শ শতকের উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহের জীবনালেখ্য। মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহীর উদ্দীন মোহাম্মদ বাবর-এর তিরোধানের পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর আমলে হাসান খান শূরের পুত্র ফরীদ খান ওরফে শেরশাহ ধূমকেতুর ন্যায় উপমহাদেশের ভাগ্যাকাশে উদিত হন। একজন জায়গীরদারের উত্তরসূরি হয়ে তিনি নিজ প্রতিভা ও মেধা বলে বলীয়ান হয়ে অল্পকালের মধ্যে দিল্লীর সম্রাট পদে বরিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্ব-কালে রাজস্ব সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে সমাসীন রয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী জনগণের কল্যাণের চিন্তায় ব্রতী। তাঁর পদাংক অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে সম্রাট ও সরকারগণ তাদের প্রশাসন বাস্তবায়িত করেছেন।

এ প্রতিভাধর, জনকল্যাণকামী, প্রজানুরঞ্জক শাসকের তথ্যনির্ভর ইতিহাস তথা জীবন কথা স্থান পেয়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে। এটা বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব মোহাম্মদ আলী চৌধুরী। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পুস্তকটি প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন—এটাই মুনাজাত।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ঢাকা
৩০শে আগস্ট '৮৬।

অনুবাদকের কথা

"হে আল্লাহ্, এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক বানিয়েছ আমাকে। কিন্তু বড় বিলম্বে। সবই তোমার ইচ্ছা, প্রভু", জীবন সায়াহ্নে এ উক্তি করেছিলেন সর্বকালের মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি, স্বহস্তে ব্যাঘ্র নিধনকারী দুর্জয় বীর, গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের অবিস্মরণীয় নির্মাতা, ভারতবর্ষের এককালের ভাগ্য বিধাতা শেরশাহ।

বস্তুতঃ শৌর্যবীর্য, শাসনাদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা ও অতুলনীয় মহত্বের জন্যে যে কয়জন মুষ্টিমেয় শাসককে নিয়ে মুসলমান জাতি বিশ্বের দরবারে গর্বানুভব করতে পারে সিংহপুরুষ শেরশাহ অবিসংবাদিত রূপে তাদের অন্যতম।

উল্লেখ করা চলে যে, শেরশাহ্ উমাইয়া খলীফা ওলিদ, তুর্কী ওসমানীয় খলীফা মহামতি সোলায়মান, খিলজী শাসক আলাউদ্দিন খিলজী, মিসরীয় মামলুক সুলতান বাইবাস, আয়ুবীয় সুলতান সালাউদ্দিন জংগী এবং মোগল সম্রাট বাবর, আকবর ও আওরংগজেবের সহিত সম আসনের দাবীদার এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের সমতুল্য।

সমসাময়িক একজন ঐতিহাসিক বলেছেন, "শেরশাহের শাসন আমলে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নতি ঘটেছে যে, একজন অক্ষম বৃদ্ধা নির্ভয়ে এক ঝুড়ি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে।"

কোন্ মহান এবং বজ্র কঠোর আদর্শের বলে বলীয়ান হয়ে মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত শাসন আমলে তাঁর পক্ষে এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল তা জানা এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

আজকের যুগে ঝন্ঝা বিক্ষুব্ধ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে উত্থান-পতন, ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাত, স্বার্থলোলুপতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা অর্থাৎ এক সার্বিক সংকটময় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজমান।

এই চরম ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম বিশ্বের কর্ণধারদের নিকট শেরশাহের শাসন ও জীবনাদর্শ বিশেষভাবে অনুসরণীয়।

"দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন"—এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন বিধি পরবর্তীকালে কি বিপুল-ভাবে মোগল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেছিল ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই তা জানা।

তাঁর সাসারামের নগণ্য জায়গীরদারী থেকে শুরু করে ধাপে-ধাপে বিচিত্রমুখী উত্থান-পতন ও দুর্বার সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত বর্ষের রাজমুকুট অর্জনের বিপুল ঘটনাবলীর জীবন্ত চিত্র "তারিখ-ই-শেরশাহী" গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

তাই এর ঘটনাবলী ঐতিহাসিক হয়েও রূপকথার মতই চমকপ্রদ এবং উপন্যাসের মতই উপাদেয়।

মাতৃভাষায় এ দুষ্প্রাপ্য এবং তথ্যবহুল পুস্তকের অনুবাদ বৃহত্তর পাঠক সমাজ বিশেষত ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের নিকট সমাদৃত হবে বলেই আশা রাখি।

ভূমিকা

এ গ্রন্থ সম্রাট আকবরের নির্দেশক্রমে প্রণীত হয়। গ্রন্থকার এর নামকরণ করেন "তারিখ-ই-আকবর শাহী"। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আহমদ ইয়াদগার লিখিত "তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানী" নামক গ্রন্থে একে "তারিখ-ই-শেরশাহী" বলে উল্লেখ করা হয়। সে থেকে গ্রন্থটি এই নামেই পরিচিত হয়ে আসছে। শেখ আলী শিরওয়ানীর পুত্র আব্বাস খান শিরওয়ানী "তারিখ-ই-শেরশাহীর" রচয়িতা। এ গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত আব্বাস খানের জীবন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি। টুকিটাকি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থকার বৈবাহিক সূত্রে শেরশাহের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রভূর বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্যবীর্যের বলে সিংহাসন বিজয়ী শেরশাহের সংঘাতময় সাফল্যমণ্ডিত জীবন ও চরিত্রের নানাবিধ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগও লাভ করেছিলেন। আব্বাস খান উঁচুমহলের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজে তেমন কোন পদ-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তিনি সম্রাট আকবরের কৃপায় পাঁচ শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন। শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি সে পদ থেকে অচিরেই অপসারিত হন, তাতে এতই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সংকল্পও করেছিলেন। কিন্তু খান খানান এ সঙ্কটকালে তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। গ্রন্থকার ও পূর্বপুরুষের ইতিহাস অবহিত হওয়ার পর খান খানান তার জন্য দু'শ টাকার মাসোহারা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরে তিনি সে মাসিক বরাদ্দ হতেও বঞ্চিত হন।

গ্রন্থটির সাহিত্যিক অবদান যতই অকিঞ্চিতকর হোক না কেন, সমসাময়িক যুগের ঘটনাবলী বিবৃত লেখা হিসেবে এর ঐতিহাসিক

তাৎপর্য ও মূল্য অপরিসীম। কেননা, লেখক তৎকালীন প্রকৃত ঘটনাবলী অবলোকন করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিলেন। গ্রন্থটি ইতিহাস নয়—জীবনী। গ্রন্থটি এমন এক রীতিতে প্রণীত, যার অনুশীলন একমাত্র নিপুণ ও শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই সম্ভব। ঘটনা প্রবাহের অংশ বিশেষ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনা করা হয়েছে। ঠিক যেন বর্ণনাকারী প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে তার উপর মতামত ব্যক্ত করেছেন। চরিত্র ও প্রকাশভঙ্গর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে নিতান্ত একঘেঁয়ে ভাষায় বিরক্তিজনকভাবেই এ সকল বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল চরিত্রের বর্ণনা একই মেজাজে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলে তাদের ব্যক্তি-উক্তি এবং গ্রন্থকারের অতি সাধারণ বর্ণনা একই বাকবহুল ও ক্লান্তিকর ভাষায় উপস্থাপিত। অবশ্য এ থেকে একটি লাভ হয়েছে, তা হলো, ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার তারিখের উল্লেখ খুবই অল্প। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই—সমসাময়িক কালের অন্যান্য গ্রন্থেও এধরনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয়।

শেরশাহ স্বীয় প্রশাসন দক্ষতার বলে অম্লান খ্যাতি লাভ করেন। সৌভাগ্যবশত আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর চরিত্র ও গুণাগুণের সঠিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। পুস্তকের এক অংশ সম্বন্ধে স্যার এইচ. ইলিয়ট বলেন,—"এ গ্রন্থের বিশেষ রীতির উপসংহার অত্যন্ত মূল্যবান।" সুবাদারদের কার্যক্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিসমূহে মতামতের প্রকাশভঙ্গি ও অনুভূতিকে দারুণভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। তিনি যে বর্ণনা করেছেন তাতে তৎকালীন স্বৈরতন্ত্রের এক ভীতিপ্রদ তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে "ওয়াকিআতি মুস্তাকীত"-এ বর্ণিত তথ্যাদিও উল্লেখ্য।

এ গ্রন্থের বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় অনুলিপিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ বাদ পড়েছে। স্যার এইচ. ইলিয়টের কাছে যে অনুলিপিটি ছিল তার অনেকাংশে সংক্ষিপ্ততার ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু সংক্ষিপ্তকরণের সময় বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে সুবিচার রক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। স্যার এইচ. ইলিয়ট সত্যিই বলেছেন, "এটা মূল গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও নির্ভেজাল অনুকৃতি।" সমগ্র অনুবাদেই ই. সি. বেলে তিনটি

পাণ্ডুলিপির সাহায্য নেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চতুর্থ পাণ্ডুলিপি তার হাতে আসে। তিনি সেটিকেও কাজে লাগান। চতুর্থ অনুলিপি অন্যান্য অনুলিপির চাইতে তুলনামূলকভাবে পূর্ণাঙ্গ ও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ধারণা করা হয় যে, এ অনুলিপি টন্‌ক-এর নবাবের নিকটই রক্ষিত ছিল। সম্পাদক স্যার ইলিয়টের পাণ্ডুলিপি ছাড়াও জেনারেল কানিংহাম সংগৃহীত অনুলিপিও ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালের লেখকগণ ইতিহাসের এ অধ্যায় রচনাকালে আব্বাস খানের গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। আহমদ ইয়াদগার এবং নেয়ামত উল্লাহ্ "তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানী" এবং "মাখযান-ই-আফগানী" গ্রন্থদ্বয়ে এ ব্যাপারে তাদের ঋণ স্বীকার করেছেন। সে গ্রন্থ দু'টি অনুবাদ করেন মিঃ ডর্ন (Dorn)। তবে পাণ্ডুলিপিটি ছিল অসম্পূর্ণ। ইসলাম খানের ইতিহাস সম্বলিত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং শেরশাহের অধস্তন শাহজাদাদের ইতিহাস সম্বলিত তৃতীয় অনুচ্ছেদ উক্ত পাণ্ডুলিপিতে একেবারেই ছিল না। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পরে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষোক্ত অনুচ্ছেদ দু'টি আব্বাস খানেরই লেখা। নেয়ামতউল্লাহ ও ইসলাম খান ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বর্তমান গ্রন্থকারের যে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন তা "তারিখ-ই-শেরশাহীর" প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত হয়নি। স্যার এইচ. ইলিয়টের মতে "ডর্নের অনূদিত গ্রন্থের বর্ণনা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্ছেদ-দ্বয় আব্বাস শিরওয়ানী কর্তৃক লিখিত হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন জেমস জোয়াট-এর অনুরোধক্রমে জনৈক মাজহার আলী খান প্রথম অনুচ্ছেদটি উর্দুতে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের ভূমিকায় লর্ড ওয়েলেস্‌লীর প্রশস্তি নজরে পড়ে। উর্দু অনুবাদটি ছিল অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। গারসীন দ্যা টাসী বলেন যে, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর অধিবাসী মীরযা লুৎফ "তারীখ-ই-শেরশাহীর" আরেকটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। মিঃ টাসী এক গ্রন্থ ইংরেজী অনুবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। উর্দু অনুবাদকের নাম নিয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। কেননা এই পুস্তকের অনুবাদ হলেও অনুবাদ দুইটির বিষয় পারস্পরিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ওয়েলেসলী এবং লর্ড কর্নওয়ালীস ছিলেন শাসক। সমসাময়িক যুগের শাসকদের প্রশংসায় লেখক পঞ্চমুখ হয়েছেন। প্রশংসার জন্য সময়টিও সঠিক ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

নিম্নলিখিত সময়ানুক্রমিক সূচীটি রচনা করেন স্যার এইচ. ইলিয়ট। সূচীটি সর্বতোভাবেই অপরিবর্তিত থাকে। টমাস কর্তৃক রচিত "পাঠান শাসকদের ঘটনাপঞ্জি" নামক গ্রন্থের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সময়ানুক্রমিক সূচীর সংগে এর কতিপয় গড়মিল লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের সময়ানুক্রমিক ঘটনা সূচী অত্যন্ত জটিল ও বিবিধ।

আবুল ফজল কর্তৃক লিপিবদ্ধ তারিখসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল। উল্লেখ-যোগ্য যে, তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তারিখ উল্লেখ করেছেন। আবুল ফজল ব্যতীত অপরাপর ঐতিহাসিক কতিপয় হিজরী সনের উল্লেখ করেছেন মাত্র।

৯৩২—ইবরাহীমের মৃত্যু। শাহযাদা হুমায়ুনের জজমাউ এবং জৌনপুর গমন।

৯৩৩---প্রত্যাবর্তন—কালপিচ, শংকা, কোল, মেওয়াটের ভার গ্রহণ।

৯৩৪—চম্বল---কনৌজ—বগজীদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ আলী জংজং-এর অভিযান। চান্দেরী-গঙ্গা ও সোগবয় বাবরের অভিযান।

৯৩৫---গোয়ালিয়র অভিমুখে বাবর---আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পর---আবার আগ্রায়, যমুনার উপর নৌকা---ইটাওয়া---কোরাকারা---চুনার---বেনারস—চৌশা---গোগরা---দিল্লীতে আগমন।

৯৩৬---হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন।

৯৩৭---১লা জমাদায় বাবরের মৃত্যু।

৯৩৮---হুমায়ুনের কালিঞ্জর অভিমুখে যাত্রা।

৯৩৯---বেন এবং বায়জীদ—জৌনপুর ও চুনার বিরুদ্ধে হুমায়ুন।

৯৪০---হুমায়ুনের দীনপানা নির্মাণ---ভোজপুর অভিমুখে গমন ও তথায় মুহম্মদ জামান ধৃত।

৯৪১---রাইসনী ও সারাংপুর হয়ে হুমায়ুনের কানাপা ও গুজরাট গমন।

৯৪২- -গুজরাটে---আগ্রা প্রত্যাবর্তন।

৯৪৩---পুনরায় জৌনপুর---তৎপর চুনার (ফিরিস্তা) দিল্লী—এলফিনস্টোনের মতে সম্ভবত আগ্রাকে বুঝাতে চেয়েছেন।

৯৪৪—জৌনপুর---চুনার---(এলফিনস্টোন)

৯৪৫—হুমায়ুনের গৌড় দখল ও তথায় অবস্থান।

৯৪৬---চৌশা—গঙ্গায় সংঘর্ষ---সফরে শেরশাহের পুনরায় বাংলা ও জৌনপুর অধিকার---কুতুব খানের কাল্পী গমন---তথায় নিহত---আগ্রায় হুমায়ুন।

৯৪৭---মহররম মাসে কনৌজ সংঘর্ষ---দিল্লী ও রোহতাস হয়ে আগ্রা হতে ত্বরিত গতিতে লাহোর অভিমুখে পলায়ন। তথায় ১লা রজবে ভ্রাতৃবৃন্দের সম্মিলন এবং ২রা জমাদা উক্ত স্থান ত্যাগ।

৯৪৮— ... ...

৯৪৯—বাংলা-—গোয়ালিয়র ও মালওয়া অভিমুখে শেরশাহ।

৯৫০—রাইসিন, আজমীর, নগর, মালদো—যেহেতু ৯৫০ হিজরীর মহররম মাস ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল, সেহেতু সম্ভবত তিনি গ্রীষ্মকালেই উষ্ণ আবহাওয়ায় রাইসিন গমন করেছিলেন। তারপর আগ্রায় ফিরে শীতকাল রাজপুতনায় কাটান।

৯৫১---এলফিনস্টোনের মনে, এ বৎসর শেরশাহ মারওয়ারে ছিলেন। আমি (ইলিয়ট)-এর সত্যতা অস্বীকার করছি। আমার মতে তখন শেরশাহ চিতোর ও কালিঞ্জরে অবস্থান করছিলেন।

৯৫২—১লা রজব কালিঞ্জরে শেরশাহের মৃত্যু। "তাবাকাত-ই-আকবরী বদাউনী" এবং "তারিখ-ই-আলফি"তে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

উদ্ধৃতিসমূহ

(আল্লাহ্ ও রসূলের প্রশংসায় নিবেদিত)

প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে শেরশাহের রাজত্বের ইতিহাস। শেরশাহের পুত্র ইসলাম খানের রাজত্বের বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শেরশাহের অধস্তন শাহযাদাদের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ইসলাম খানের পরে এ সব শাহযাদা সিংহাসনের দাবি তুলে নিজ নামে খোতবা পাঠ ও নামাঙ্কিত মোহরের প্রচলন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম খানের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

আমি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার মহামতি আকবরের গৌরবময় রাজ-প্রাসাদের একজন নগণ্য আশ্রিত ব্যক্তি মাত্র। আমার নাম আব্বাসী। পিতার নাম শেখ আলী শিরওয়ানী। সম্রাট আকবরের নির্দেশক্রমে আফগান রাজত্বের এই ইতিহাসখানা প্রণয়ন করেছি।

তারিখ-ই-শেরশাহী

লেখকের অন্যান্য বই

*মুসলিম বাংলার মনীষা (৩য় সংস্করণ প্রকাশের পথে)
*রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব
*কনকচাঁপার ডোর

প্রথম পরিচ্ছেদ

শেরশাহের রাজত্বের বর্ণনা

আমি বিশ্বস্ত আফগানদের নিকট থেকে এ ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছি। যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁরা ইতিহাস ও বাক্যালঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁরা রাজত্বের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শেরশাহের উত্থান-পতনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং সম্রাটের গোপনীয় রাজকার্যেও তাঁরা সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া অপরাপর যে সকল ব্যক্তির তথ্য সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি তা-ও আমার গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অধিকন্তু সংগৃহীত তথ্যের সংগে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসত্য বলে প্রতিপন্ন ঘটনাসমূহ এ গ্রন্থে স্থান পায়নি।

'শাহ খাইল' পরিবার ও লোদী আফগান গোত্রসম্ভূত সুলতান বাহলুল যখন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন তখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার ছিল বিভিন্ন নরপতির হাতে। তাঁরা নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও মসজিদে খুতবা পাঠ করাতেন। সুলতান বাহলুলের বিরুদ্ধে তাঁরা বৈরী ভাব পোষণ করতেন। তখন জৌনপুরের অধিপতি ছিলেন সুলতান মাহমুদ বিন সুলতান ইবরাহীম শারকী। মালাবারে রাজত্ব করতেন সুলতান মাহমুদ খালজী। তাছাড়া গুজরাটে সুলতান কুতুবুদ্দীন, দাক্ষিণাত্যে সুলতান আলাউদ্দিন আহমদ শাহ, এবং কাশ্মীরে সুলতান জয়নুল আবেদীন রাজত্ব করতেন। কিন্তু বাংলাদেশ ও থাট্টার শাসকদের নাম আমি জানতে পারিনি। মুলতানের রাজদণ্ড হস্তে ধারণ করেছিলেন শেখ মখদুম বাহাউদ্দীন যাকারিয়া কোরায়শীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শেখ ইউসুফ সুলতান। বাহলুল যতদিন রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করেছিলেন ততদিন এ সকল রাজন্যবর্গ প্রকাশ্যে কোনরূপ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হননি।

জারিধীর জমিদার রাই শিহার লংঘা মুলতান শহর থেকে শেখ ইউসুফকে বিতাড়িত করে রাজ্যটি দখল করে নেন এবং সুলতান কুতুবুদ্দীন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেখ ইউসুফ দিল্লীতে এসে সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সুলতান বাহলুল স্বয়ং তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে মুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাথে ছিলেন শেখ ইউসুফ। এ সুযোগে জৌনপুর অধিপতি সুলতান মাহমুদ দিল্লী অবরোধ করলেন।

সুলতান বাহলুল দীপালপুরে দিল্লী অবরোধের খবর জানতে পারলেন। একবার তিনি অমাত্য ও মন্ত্রীদের কাছে অভিমত জানিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের রাজ্যগুলো অত্যন্ত বিস্তৃত ও সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ এ দেশেরই অধিবাসী। মাতৃভূমিতে এখনও আমার অনেক আত্মীয় রয়েছেন যারা শৌর্যবীর্যের জন্য বিশেষভাবে প্রখ্যাত। অথচ এখন জীবিকার্জনের সংগ্রামেই তারা জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করেছেন। তাঁরা এখানে এলে একদিকে নিজেরা দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত, আমিও হিন্দুস্থানকে পদানত করে শত্রু পক্ষকে বিনাশ করতে পারতাম।'

তাঁর অমাত্যবর্গ প্রত্যুত্তরে একটি পত্রের মুসাবিদা দিয়ে বললেন, '...বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহ রাজ্যের গোত্রাধিপতিদের নিকট এ মর্মে লেখা উচিত : আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে দিল্লীর সিংহাসন আজ আফগানদের অধিকারে। কিন্তু এখানকার রাজন্যবর্গ আফগানদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে চায়। পরিস্থিতির বর্তমান পর্যায়ে আমাদের রমণীদের মান-ইয্‌যতের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছে। ভারত বিরাট দেশ এবং ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশ অগণিত মানুষের জীবিকার সংস্থান করে দিতে পারে। তোমরা এদেশে আগমন কর। সার্বভৌম অধিকার আমারই থাকবে, তবে বিজিত রাজ্য আমরা ভাইয়ের মত বন্টন করে ভোগ দখল করব। জৌনপুর অধিপতি দিল্লী অবরোধ করেছেন। আফগানদের পরিবার দিল্লী নগরীতেই আবদ্ধ। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও; বিরাট বাহিনী নিয়ে অনতিবিলম্বে আগমন কর।'

...সুলতান অমাত্যের এ উপদেশ গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন আফগান দলপতির নিকট এ-মর্মে ফরমান প্রেরিত হলো। ফরমান লাভ করার

পরপরই রোহের আফগান অধিবাসীরা পঙ্গপালের মত ও ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে এসে সুলতানের বাহিনীতে যোগদান করে।

বাহলুল দিল্লীর নিকটবর্তী হলে তাকে প্রতিহত করার জন্য সুলতান মাহমুদ শরকী একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। সুলতান মাহমুদের সিপাহ-সালার ফতেহ্ খান বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বিপুল সংখ্যক হস্তী নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু আফগান বাহিনী অনতিবিলম্বে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রু বাহিনীকে মুহূর্তের মধ্যে নাস্তানাবুদ করে দেয়। ফতেহ্ খানের মৃত্যুর খবর শুনে সুলতান মাহমুদ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন। ভারতের এক বিরাট ভূ-খণ্ড সুলতান বাহলুলের পদানত হল।

শাহ-খাইল বাহলুলী পরিবার সম্ভূত এবং মাহমুদ-খাইল গোত্রের সর্দার কালু খান উক্ত যুদ্ধে আহত হন। সুলতান বাহলুল ক্ষতিপূরণ বাবদ তার নিকট অতেল অর্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু কালু খান এই বলে সে টাকা প্রত্যাখ্যান করলেন, 'আমি রক্ত বিক্রি করতে এখানে আসিনি।' ঠিক এসময়ে কয়েকজন বিখ্যাত দলপতি দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সুলতান বাহলুলের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সুলতান এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের সাহায্যার্থেই এগিয়ে এসেছিলাম। এখন আপনি আমাদের বিদায়ের অনুমতি দিন। পরবর্তী সময়ে আমরা পুনরায় আপনার চাকুরীতে যোগদান করব।' সুলতান তাদের প্রভূত অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করলেন। এতদ্ব্যতীত সুলতান প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। যে সমস্ত আফগান সুলতানের সাথে রয়ে গেলেন, তারা প্রভূত সম্মান ও পছন্দসই জায়গীর পেলেন। তবে বীর কালু খান কিছুই নিলেন না। তিনি বললেন, 'কোন দান গ্রহণ করতে পারলাম না বলে জাঁহাপনা আমাকে ক্ষমা করবেন। কেননা কোনরূপ পার্থিব স্বার্থলাভের আশায় আমি ভারতে আগমন করিনি।'

রোহের দলপতিগণ বিদায় নিলেন। সুলতান অমাত্যবর্গকে আদেশ করলেন—'রোহ অঞ্চল থেকে যে সকল সাধারণ আফগান আমার সাহায্যার্থে ভারতে এসেছে তাদের প্রত্যককে আমার কাছে নিয়ে আসুন। তাঁরা দেশে যে পরিমাণ ভূমির মালিক ছিল আনুপাতিক হারে আমি তার চাইতে বেশী ভূমির জায়গীর প্রদান করে তাদের সন্তুষ্ট করব, কিন্তু কেউ

যদি বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাদের কারো সাথে থাকতে চায় তাহলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তাকে নিয়োগ করতে হবে। যদি আমি শুনতে পাই যে, রোহের কোন আফগান জীবিকা কিংবা চাকুরীর অভাবে নিজ দেশে ফিরে গেছে তজ্জন্য দায়ী অমাত্যের জায়গীর বাজেয়াফত করা হবে।'

আফগানগণ ঐ সমস্ত খবর শুনে এবং তাদের প্রতি সুলতানের স্নেহ ও আনুকূল্য উপলব্ধি করে প্রতি দিন, প্রতি মাস এবং প্রতি বছর দলে দলে ভারতে আসতে লাগল। তারা নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জায়গীর লাভ করলো। সুলতানের এই বদান্যতার সময়েই শেরশাহের পিতামহ ইব্‌রাহীম খান সুর তদীয় পুত্র হাসান খানকে সংগে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ভারতে আগমন করেন। হাসান খান শেরশাহের পিতা। ইব্‌রাহীম খান যে অঞ্চলে এসেছিলেন আফগান ভাষায় তার নাম 'শারগারী' কিন্তু মুলতানী ভাষায় বলা হত 'রোহরী'। সুলায়মান পর্বতমালা থেকে উদ্‌গত এই দীর্ঘ উচ্চ ভূমিটি দৈর্ঘে ৭/৮ ক্রোশ। ভূখণ্ডটির অবস্থিতি গুমাল নদীর তীরে। ইব্‌রাহীম খান, হাসান খান সুর, মহব্বত খান সুর ও দাউদ শাহ খাইলের অধীনে চাকুরী নেন। সুলতান বাহলুল মহব্বত খান সুর এবং দাউদ শাহ খাইলকে পাঞ্জাবের হরিয়ানা, বহস্যালা প্রভৃতি পরগনার জায়গীরদারী প্রদান করেছিলেন। তারা বাজওয়ারা পরগনায় বাস করতেন। শেরশাহ সুলতান বাহলুলের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় ফরিদ খান।

কিছুদিন পর ইব্‌রাহীম খান মহব্বত খানের চাকুরী ছেড়ে জামাল সারাং খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। জামাল খান তাকে নরনাউল পরগনায় চল্লিশটি অশ্বারোহীর একটি ইউনিট শিবির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও তজ্জন্য কয়েকটি গ্রামের জায়গীরদারী প্রদান করেন। ফরিদ খানের পিতা মসনদ-ই আলা উমর খান শিরওয়ানী খালকাপুর-এর অধীনে চাকুরী নেন। মসনদ-ই আলা খান-ই-আজম উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান বাহলুলের পারিষদ ও পরামর্শ দাতা। মসনদ-ই-আলা খাটার খানের মৃত্যুর পর বাহলুল উমর খানকে লাহোরের শাসনভার প্রদান করেন। তিনি সির-হিন্দ, ভাটনুর, শাহবাদ, পায়েলপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জায়গীর লাভ করেন। তাঁর কাছ থেকে হাসান খান 'শাহবাদ' পরগনার কয়েকটি গ্রামের জায়গীর পান।

কিছুদিন পর ফরিদ খান তাঁর পিতার নিকট গিয়ে বললেন, 'আমাকে মসনদ-ই-আলা উমর খানের সমীপে নিয়ে চলুন এবং তাকে বলুন, 'ফরিদ খান আপনার অধীনে চাকুরী নিতে চায়। যে কার্যের জন্য উপযুক্ত মনে হয় সে কার্যেই তাকে নিযুক্ত করুন।' হাসান পুত্রের অল্প বয়সের কথা চিন্তা করে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেন। ফরিদ খান তাঁর মায়ের কাছে আব্দার তুললেন। মা হাসান খানকে বললেন—'ফরিদ যখন মসনদ-ই-আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক তখন তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন। মসনদ-ই-আলা এত অল্প বয়স্ক বালকের অনুরোধে খুশী হয়ে তাকে কোন কাজের দায়িত্বভার হয়ত দিতে পারেন।' হাসান খান পুত্র ও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফরিদকে মসনদ-ই-আলার নিকট নিয়ে বললেন—'ফরিদ আপনার অধীনে চাকুরী গ্রহণ চায়।' উমর খান বললেন, 'ফরিদ এখনও নিতান্ত বালক। বড় হলে তাকে উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করা যাবে। এখন সাময়িকভাবে তাকে শাহাওয়ালী গ্রামে ক্ষুদ্র পল্লীটির দায়িত্ব দিলাম।' হাসান খান ও ফরিদ খান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ফরিদ মায়ের নিকট গিয়ে বললেন—'আপনি অনুরোধ না করলে আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন না। মসনদ-ই-আলা আমাকে শাহবাদ পরগনার একটি পল্লী দিয়েছেন।'

এর কয়েক বছর পর হাসান খানের পিতা ইবরাহীম খান নারনাইলে মৃত্যুবরণ করেন। হাসান খান পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শাহবাদ ত্যাগ করে উমর খানের নিকট যান। উমর খান তখন বাহলুলের সৈন্য বাহিনীর সংগে অবস্থান করছিলেন। পিতার পরিবারবর্গের সাথে শোক-পর্বে যোগ-দানের জন্য হাসান খান উমর খানের নিকট ছুটি প্রার্থনা করলেন এবং বললেন যে, তিনি পুনরায় উমর খানের সংগে যোগদান করবেন এবং পার্থিব কোন ধন-সম্পদের মোহে অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করবেন না। উত্তরে উমর খান বললেন, 'তোমার জানা আছে যে, আমার অধিকারভুক্ত সমস্ত জায়গীরের অংশ তোমাকে প্রদান করেছি। সুতরাং অন্য লোককে আমি স্থান দিতে পারি না। তোমার পরিবারের সবাই তোমার ব্যাপারে আশাবাদী। তুমি তোমার পিতার জায়গীরের উত্তরাধিকারী হবে, এমনকি পিতার জায়গীরের চাইতে বৃহত্তর জায়গীরের অধিকারী হবে। তোমাকে শুধু একটি ছোট্ট জায়গীরেই রেখে দেব এমন অবিচার আমি কিছুতেই করব না।'

আফগানদের হৃদয় ছিল এমনি উদার এবং স্বীয় গোত্রের প্রতি তাদের অন্তরের টান ছিল এতই তীব্র।

অমাত্যের অধীনস্থ কোন আফগান কর্মচারীর যদি অন্যত্র অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিত সেই অমাত্য তৎক্ষণাৎ উক্ত কর্মচারীকে প্রশংসা সনদসহ তদবীর করে তথায় পাঠিয়ে দিতেন! এভাবে তার উত্তম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

হাসান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পরদিন মসনদ-ই-আলা জোর সুপারিশ পত্রসহ তাঁকে জামাল খানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নতুন কয়েকটি গ্রাম ও জায়গীরসহ পিতৃজায়গীর হাসান খানকে অর্পণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। মসনদ-ই-আলা জামাল খানের নিকট পত্রে বললেন, 'হাসান খানের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা আমার প্রতি খাতির প্রদর্শনেরই শামিল।' তারপর একটি অশ্ব ও সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করে তিনি হাসান খানকে বিদায় দিলেন। তিনি জামাল খানের অধীনে পরম নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ শুরু করলেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও কর্ম-দক্ষতায় জামাল খান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

সুলতান বাহলুলের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সিকান্দার সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ভ্রাতা বাইবাকের কাছ থেকে জৌনপুর কেড়ে নিয়ে উক্ত সুবা জামাল খানকে প্রদান করেন। জামাল খান ১২ সহস্র অশ্বারোহীর এক সেনাদল গঠনের আদেশ পেলেন। উক্ত বাহিনীকে জায়গীর প্রদানের অধিকারও লাভ করলেন। জামাল খান হাসান খানের কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দিলেন বেনারসের নিকটবর্তী শাসারাম, হাজীপুর ও টানডা পরগনার প্রশাসনের কর্তৃত্ব। হাসান খান তথায় পাঁচশত অশ্বারোহী রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করেন। হাসান খানের ছিল আট পুত্র। ফরিদ ও নিজাম এক আফগান রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আলী এবং ইউসুফের জননী ছিলেন অন্যজন। হাসান খানের তৃতীয় পত্নীর সন্তান ছিলেন খুররম ও সাদী খান। চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন সুলায়মান ও আহমদ।

হাসান খান ফরিদ এবং নিজামের মাতাকে মোটেই ভালবাসতেন না। কেননা বাঁদীদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই অনুরক্ত। বিশেষত সুলায়মান ও আহমদের মাতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সবচাইতে বেশী। এ মহিলা তাঁর উপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, হাসান খান প্রকৃতপক্ষে

চতুর্থ পত্নীর বশংবদে পরিণত হয়েছিলেন। হাসান খান ও ফরিদের মধ্যে সব সময়েই তিক্ত কথাবার্তা বিনিময় হতো। জায়গীর প্রদানের সময় ফরিদের প্রতি তার পিতা এতটুকু আনুকূল্যও প্রদর্শন করেন নি এবং ফরিদের ইচ্ছামাফিক জায়গীরও প্রদান করেন নি। পিতার উপর বিরক্ত হয়ে ফরিদ জামাল খানের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে জৌনপুর যান। ফরিদের জৌনপুর গমনের কথা জানতে পেরে তার পিতা জামাল খানের নিকট এক পত্রে লিখলেন—'ফরিদ খান আমার উপর বিরক্ত হয়ে নিষ্প্রয়োজনে আপনার কাছে চলে গেছে। আশা করি আপনি অনুগ্রহ করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু সে যদি আপনার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে আপনার দরবারে স্থান দেবেন। আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে সে নৈতিক জ্ঞান ও নম্রতা শিক্ষা পাবে।'

জামাল খান ফরিদকে বোঝাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন এবং পিতার নিকট ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ফরিদ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন— 'আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করানোই যদি পিতার উদ্দেশ্য হয়; তাহলে এ শহরেই অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন। আমি এখানে তাঁদের কাছে বিদ্যার্জন করব।' জামাল খান আর আপত্তি করলেন না। ফরিদ জৌনপুরে আরবী শিক্ষায় নিজেকে নিমগ্ন করলেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ করলেন। এ বিষয়ে কাযী শাহা-বুদ্দীনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করলেন। প্রায় সমস্ত প্রাচীন রাজ-রাজার জীবনীও তিনি অধ্যয়ন করেন। 'সিকান্দার নামা', 'গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। দর্শন শাস্ত্রে ও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর। পরবর্তীকালে রাজত্বের সময় কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে 'হাশিয়া-ই-হিন্দ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। শেষ বয়স পর্যন্ত ইতিহাস ও প্রাচীন শাসকদের জীবনীর প্রতি তাঁর অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

কয়েক বছর পর হাসান খান জামাল খানের নিকট আগমন করলেন। অবশ্য এ আগমন নিষ্প্রয়োজনে নয়। হাসান খানের আগম-নের হেতু ছিলঃ একজন কেনা বাঁদীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দরুনই ফরিদকে গৃহত্যাগী হতে হয়েছে, তাই আত্মীয় স্বজনগণ হাসান খানেক ভর্ৎসনা করে চলছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল, ফরিদ বালক হলেও তার মধ্যে মহত্ত্বের বীজ লুক্কায়িত, তাঁর ললাটে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সব লক্ষণ

দেদীপ্যমান। সমগ্র সুর গোত্রে তার মত শিক্ষিত জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তি একটিও নেই। সে এতদূর সুশিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করেছে যে, হাসান খান তার উপর পরগনার শাসনভার অর্পণ করলে সে নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের সাথে স্বীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে। হাসান খান আত্মীয়-স্বজনের কাছে রাযী হয়ে বললেন, 'তাকে শান্ত করে আমার নিকট ফিরিয়ে আন, তোমরা যা বলবে আমি তাই করব, বন্ধুরা হাসানকে পরামর্শ দিলেন—জৌনপুরে জামাল খানের নিকট গিয়ে ফরিদকে দুটি পরগনার শাসনভার প্রদান করাই আপনার পক্ষে শ্রেয়।' হাসান খান আত্মীয়দের এ পরামর্শে রাযী হলে উল্লাসিত হয়ে তারা ফরিদের নিকট গিয়ে বললেন—'তোমার পক্ষ হয়ে আমরা যে সমস্ত দাবী করেছি মিয়া হাসান খান তাতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করি তুমিও আমাদের কথায় রাযী হবে।' ফরিদ খান উত্তরে বললেন—'তোমাদের প্রত্যেক কথায় আমার পূর্ণ সম্মতি রয়েছে, আমি কখনো তোমাদের কথা অগ্রাহ্য করব না কিন্তু আমার পিতা যখন বাঁদীর সম্মুখে দাঁড়াবেন তখন সে যা বলবে তিনি সুবোধ বালকের মত তা-ই পালন করবেন।' আত্মীয়রা তবু নাছোড় বান্দা। তারা বললেন, 'যাই হোক না কেন তুমি আমাদের কথায় রাজী হয়ে যাও। হাসান খান যদি প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ করেন তাহলে আমরা তার মুকাবিলা করব।''

আত্মীয় স্বজনের এসব কথাবার্তা শ্রবণ করে বললেন—'তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি দু'টি জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। দায়িত্ব পালনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' ফরিদ খান আত্মীয়বর্গের সাথে পিতার সাক্ষাত লাভ করে আনন্দিত হলেন। পিতা ও নিরতিশয় খুশী হয়ে ফরিদকে কয়েক মাস নিজের সংশ্রবে রাখলেন। পরে ফরিদকে তাঁর এখতিয়ারাধীন পরগনায় পাঠানোর জন্য হাসান খান ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ফরিদ একটি ব্যাপারে পিতার সাথে আলাপ করতে চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি হাসান খানকে বললেন—'ঐ পরগনাসমূহে অনেকগুলো সৈন্য, অধীনস্থ ব্যক্তি ও আত্মীয়-স্বজনের জায়গীর রয়েছে। আমি জেলার উন্নতি বিধানকল্পে আত্মনিয়োগ করব। কেননা জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, 'ন্যায় ভিত্তিক শাসন-কার্যের উপর পরগনার উন্নতি নির্ভর করে।' পুত্রের কথা শুনে হাসান খান অত্যন্ত গৌরব বোধ করলেন, তিনি বললেন, 'জায়গীর মঞ্জুর ও তা বাতিল করার উভয়বিধ ক্ষমতাই তোমাকে প্রদান করা হল। তোমার কাজে

আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করব না।' তারপর তিনি ফরিদ খানকে সকল আনুকূল্যের আশ্বাস দিয়ে মঞ্জুরকৃত পরগনায় পাঠালেন। শাসনভার হাতে নিয়ে ফরিদ খান সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (মুকাদ্দামান) কৃষক (মুজারিয়ান-যাদের উপর জেলার উন্নতি নির্ভর করে) এবং গ্রামীণ হিসাব রক্ষককে (পাটওয়ারীদের) তলব করলেন।

তারা ফরিদের সমীপে হাযির হলো। ফরিদ সৈন্যবাহিনী:কও দরবারে তলব করে বললেন—'আমার পিতা আপনাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেছেন। আমি জেলার উন্নতিকল্পে দৃঢ় সংকল্প। এর সাথে আপনাদের স্বার্থও জড়িত। এভাবেই আমি নিজের সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দেবার পর তিনি কৃষকদের উদ্দেশে বললেন—'রাজস্ব আদায়ের পন্থা নির্ধারণের ভার আজ আপনাদের দেওয়া হলো। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সমঝোতার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পন্থা আজ বাছাই করতে হবে।

কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নির্দিষ্ট মুদ্রা করের প্রদানের জন্য লিখিত চুক্তিনামার (পাট্টাও কবুলিয়াত) সুপারিশ করলেন। কতিপয় ব্যক্তি অর্থের বদলে দ্রব্যের বিনিময় খাজানা (কিসমত-ই-খানা) পরিশোধের পক্ষে মত দিলেন। সবরকম প্রস্তাব বিবেচনা করে ফরিদ খান জমি ইজারা ও চুক্তিনামা (কবুলিয়াত) ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন। ভূমি জরিপের জন্য তিনি কর্মচারীদের বেতন নির্দিষ্ট করে দিলেন। খাজানা আদায়-কারী এবং জরিপকারীদের (মুহাশাশীলানা) জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হল। ফরিদ খান 'চৌধুরী' এবং নেতৃবৃন্দকে বললেন—'আমি ভাল-ভাবেই জানি যে, গরীব কৃষকদের উপরই কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তাদের অবস্থা যদি শোচনীয় হয়ে পড়ে তবে তারা কিছুই উৎপাদন করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হলে তারা প্রচুর ফসল ফলাতে পারবে। কৃষকদের উপর তোমাদের অত্যাচার ও জোর-পূর্বক অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা আমার জানা আছে। এই জন্যই আমি জরিপকারী ও কর সংগ্রাহকদের বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। নির্দিষ্ট পরিমাণ করের বেশী আদায় করলে মনে রাখবেন ঐ অর্থভোগের সুযোগ আমি অবশ্যই আপনাদের দেবো না। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আমি নিজে উপস্থিত থেকে করের যাবতীয় হিসাব তত্ত্বাবধান করব।

যে খাজনা সঠিকভাবে নেয়া হবে তা আমি মঞ্জুর করব এবং তা আদায়ের জন্য কৃষকদের বাধ্য করব। আমি শরৎকালীন ফসলের খাজনা শরৎকালে এবং বসন্তকালীন ফসলের খাজনা বসন্ত কালেই আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ বকেয়া খাজনা একটি পরগনা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অচিরে সরকার ও প্রজার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। ওজনের ব্যাপারে কৃষকদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং সত্যিকার উৎপাদনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হওয়া শাসকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু কর আদায়ের সময় কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা অনুচিত। অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে খাজনা আদায় করতে হবে। কোন কৃষক যদি খাজনা প্রদানের ব্যাপারে গড়িমসি কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তখন আর কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহসী হবে না।' তারপর তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বললেন—'আপনাদের কোন বক্তব্য থাকলে সরাসরি আমার কাছে পেশ করতে পারবেন। আপনাদের উপর কেউ অত্যাচার করবে এটা আমি বরদাশ্ত করব না।'

বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিয়ে তিনি কৃষকদের বিদায় দিলেন। কৃষকদের প্রস্থানের পর তিনি অফিসার-বৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'কৃষককূল হচ্ছে সকল উন্নতির উৎস। আমি তাদের উৎসাহ প্রদানপূর্বক বিদায় করেছি। তারা যেন কারো উৎপীড়নের শিকার না হয় সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে সর্বক্ষণ। কোন শাসক যদি তার কৃষককূলকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের নিকট কর আদায় করা নির্ভেজাল স্বৈরাচার বটে। ফরিদ খান অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার পরগনায় কতিপয় জমিদার অবাধ্য আচরণে লিপ্ত হয়েছে। তারা সুবাদারের দরবারে (মাহকানা-ই-হাকিম) হাযির হয়নি। সঠিকভাবে কর পরিশোধ করেনি। অধিকন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামে গোলযোগের সৃষ্টি করছে। আমি কি তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ধ্বংস করতে পারি?' অফিসারবৃন্দ উত্তরে বললেন—'অধিকাংশ সৈন্য হাসান খানের সংগে রয়েছে। তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুদিন অপেক্ষা করুন।' ফরিদ বললেন, 'তারা যখন আমার সংগে আসতে অসম্মতি জানিয়েছে তখন আমার ধৈর্য ধরে থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া আমি আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকতে দিতে পারি না।

কিভাবে এসমস্ত বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা যায় আপনারা তার উপায় খুঁজে বের করুন।' দু'শত অশ্ব সজ্জিত করার জন্য তিনি পিতার অমাত্যদের নির্দেশ দিলেন। পরগনায় অবস্থানরত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণের জন্যও আদেশ জারি করা হলো। যে সমস্ত আফগান ও সহগোত্রীয় ব্যক্তির জায়গীর নেই তিনি তাদের ডেকে বললেন— 'মিয়া হাসান ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আপনাদের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাব। বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যে সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করবেন তা আমাদেরই থাকবে। আমি তার উপর কোন অংশ চাইনে। যাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন আমি মিয়া হাসানের নিকট হতে সুপারিশ করে তাঁদের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থা করব। আমি নিজেই আপনাদের যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' এ প্রস্তাব শুনে আফগান ও সমগোত্রীয় লোকেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা সকলে সাধ্যমত কর্তব্য কর্ম হিসাবে কর্ম সম্পাদনের ওয়াদা করলেন। অভিযানে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের তিনি কৌতুকপ্রদ হাস্যরসে আনন্দ দান করলেন। তিনি তাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং কিছু নগদ অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপর ফরিদ খান কৃষকদের নিকট অশ্ব চেয়ে পাঠালেন। ফরমানে বলা হলো, 'তোমাদের অশ্বগুলো আমাকে কিছুদিনের জন্য ধারস্বরূপ প্রদান কর।' ওগুলো আমার বিশেষভাবে প্রয়োজন, আমি তোমাদের অশ্ব ফিরিয়ে দেব।' কৃষকগণ আগ্রহের সাথে সন্তুষ্ট চিত্তে অশ্ব ধার দিতে রাযী হল। প্রত্যেক গ্রাম থেকে এক বা একাধিক ঘোটক প্রেরিত হলো। ঘরে রক্ষিত জিন দিয়ে অশ্ব সজ্জিত করা হল। সৈন্যদের যাদের অশ্ব নেই তারা একটি করে অশ্ব লাভ করল। ফরিদ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রগুলো লুন্ঠিত হল। ফরিদ বিদ্রোহীদের শিশু-সন্তান, স্ত্রী ও সম্পত্তি দখল করে নিলেন। লুন্ঠিত সম্পত্তি ও গৃহপালিত পশু সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। কিন্তু মহিলা, শিশু ও কৃষকদিগকে নিজের অধীনে আবদ্ধ করে রাখলেন। অতঃপর বিদ্রোহী দলপতিকে বলে পাঠালেন—'আমার প্রাপ্য আদায় কর। নতুবা তোমাদের শিশু ও মহিলাদের আমি বিক্রি করে দেব। তোমাদের কোথাও বসতি স্থাপন করতে দেব না। যেখানে যাবে সেখানেই আমি তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করব। যে গ্রামেই যাও না কেন তোমাদের বন্দী করে আমার হাতে সমর্পণের জন্য তথাকার নেতৃবৃন্দকে আদেশ দেব। অন্যথায় আমি

তাদেরও আক্রমণ করব।' এ হুশিয়ারী বিদ্রোহের নায়কদের ভীত করে তুললো। তারা বলে পাঠালো, 'আমাদের কৃত অপরাধ মার্জনা করুন। এর পরে যদি আমরা পুনরায় কখনো এরূপ অপরাধ করি তাহলে আপনি যেমন ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করবেন।' ফরিদ খান উত্তরে বলে পাঠালেন, 'তোমাদের প্রতিভূ দিতে হবে। তোমরা যদি পুনরায় অপরাধ করে পালিয়ে যাও তাহলে জামিনদারকেই তার জন্য দায়ী হতে হবে এবং তোমাদের আমার সম্মুখে হাযির করার দায়িত্ব নিতে হবে। যে সব জমিদারের স্ত্রী-সন্তান ফরিদের নিকট আবদ্ধ রয়েছে তারা সরকারের বকেয়া কর আদায় করে নিজেদের প্রতিভূ পেশ করল, তারপর তারা নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ফরিদ খানের নিকট হতে মুক্ত করে নিল।

কতিপয় জমিদার অপরাধবৃত্তির সকল ধাপে বিচরণ করেছে। চুরি, ডাকাতি, প্রকাশ্য রাজপথে রাহাজানি কোনটিই তারা বাদ রাখেনি। তারা কর প্রদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল, কখনো বা সুবাদারের দরবারে হাযির হয়নি। অধিকন্তু নিজেদের ক্ষমতা ও সংখ্যা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা-বশত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ শুরু করে। হুশিয়ারী সত্ত্বেও তারা কখনো সতর্ক হয়নি।

এদের দমনের জন্য ফরিদ খান সৈন্য সংগ্রহ করলেন। যে গ্রামবাসীদের অশ্ব রয়েছে তাদের অশ্বারোহণপূর্বক এবং অবশিষ্টদের পদব্রজে দরবারে হাযির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। অর্ধেক বাহিনীকে তিনি নিজের সংগে নিলেন এবং বাকী অর্ধাংশকে কর ও স্থানীয় শুল্ক আদায়ের কাজে নিয়োগ করলেন।

সৈন্য বাহিনী ও কৃষককুল একত্র হওয়ার পর তিনি বিদ্রোহীদের গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। একক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর তিনি একটি পরিখা খনন করলেন এবং আশেপাশের অরণ্য কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। গ্রামের সর্বত্র টহল দিয়ে যাকে সামনে পাওয়া যায় তাকে হত্যা করার জন্য অশ্বারোহীদের আদেশ দেয়া হল। সৈন্যদের উপর নির্দেশ রইল, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করতে হবে, গৃহ-পালিত পশুকে ধরে আনতে হবে, ফসলের চারা লাগাতে দেয়া যাবে না, রোপিত ফসল ধ্বংস করতে হবে, পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অবরুদ্ধ এলাকায় কিছু আনার অনুমতি দেয়া যাবে না কিংবা অত্র এলাকা হতে কোন দ্রব্য

বাইরে নিয়ে যেতে দেয়া হবে না। অহর্নিশ কড়া পাহারা দিতে হবে। একটি প্রাণীও যাতে বাইরে যেতে না পারে তজ্জন্য ফরিদ খান নিজ বাহিনীকে বারবার কড়া নির্দেশ দিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করার আদেশ রইল পদাতিক বাহিনীর উপর। সমস্ত অরণ্য কেটে পরিষ্কার করার পর তিনি পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিকটবর্তী গ্রামে আর একটি পরিখা খনন করলেন এবং গ্রামটির বিদ্রোহীদের দমন করলেন। বিদ্রোহীরা বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা সংবাদ প্রেরণ করল যে, ফরিদ খান যদি ক্ষমার আশ্বাস দেন তবে তারা আত্মসমর্পণ করবে। উত্তরে ফরিদ খান বললেন যে, তিনি তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে না। আল্লাহ্ যার সহায় বিজয় তার হবেই। বিদ্রোহিগণ সর্বাত্মক পরাজয় স্বীকার করে প্রচুর অর্থ পাঠালো। কিন্তু ফরিদ খান বিদ্রোহীদের টাকা গ্রহণ করলেন না। তিনি তাদের প্রতিনিধিকে বললেন, 'বিদ্রোহীদের স্বভাবই এই। প্রথমত তারা তাদের শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, যদি শাসক দুর্বল হন তবে তারা বিদ্রোহ অব্যহত রাখবে। কিন্তু শাসককে শক্তিশালী মনে হলেই বিদ্রোহিগণ তার নিকট এসে বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করে, করুনা যাচে এবং বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রদানে সম্মত হয়। এভাবে শাসকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র পুনর্বার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে পুরনো পথে পা বাড়ায়।

প্রত্যূষে ফরিদ খান অভিযান চালিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ জমিদারদের পর্যুদস্ত ও হত্যা করলেন। নারী ও শিশুদের বন্দী করে তাদের বিক্রয় কিংবা ক্রীতদাস হিসেবে রাখার অনুমতি দিলেন। ফরিদ খান অন্যান্য স্থান থেকে লোকদের গ্রামে এনে বসতিস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হল। বহুসংখ্যক বিদ্রোহী মৃত্যু ও কারা দণ্ডের ন্যায় কঠোর শাস্তির কথা শুনতে পেয়ে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ ত্যাগ করে সুবোধ নাগরিকের ন্যায় বসবাস শুরু করলো। সৈনিক কিংবা কৃষকের কোন অভিযোগ থাকলে ফরিদ খান ব্যক্তিগতভাবে সতর্কতাসহকারে অনুসন্ধান করতেন। কোন গাফিলতি তিনি প্রশ্রয় দিতেন না।

অত্যল্পকালের মধ্যেই পরগনাদ্বয় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। সৈনিক এবং কৃষককুল ও সুখী হলেন। এ সংবাদ পেয়ে মিয়া হাসান যারপর নাই সন্তুষ্ট

হলেন। তিনি পুত্রের কৃতিত্বে পরগনার উন্নতি তার শৌর্যবীর্য ও বিদ্রোহী জমিদার দমনের কথা সগৌরবে সকলের কাছে নজীর হিসাবে প্রচার করতেন।

ফরিদের পারদর্শিতার সংবাদ দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিহার রাজ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তথাকার রাজন্যকুল অমাত্যবর্গ তাঁর গুণকীর্তন করতে থাকেন। তিনি প্রজাদের মধ্যে সুনাম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন এবং তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য জ্ঞাতি-পরিজন হলেন নিরতিশয় সন্তুষ্ট। শুধুমাত্র কতিপয় শত্রু ও বিমাতা সুলায়মানের জননী ফরিদের এই কর্ম প্রতিভায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

কিছুদিন পর মিয়া হাসান মসনদ-ই-আলা মিয়া জামাল খানের দরবার থেকে ফিরে এলেন। অভিজাত শ্রেণী ও সৈন্য-সামন্তগণ একবাক্যে নিজেদের উন্নতি এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধির ও রাজ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির খবর হাসান খানের কাছে পেশ করলেন। পুত্রের কৃতিত্বে উল্লসিত পিতা ফরিদের প্রতি তাঁর পূর্বেকার বিরক্তি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হলেন। তিনি ফরিদ ও তার ভ্রাতাকে সর্বপ্রকার আনুকুল্যে অভিষিক্ত করলেন। তিনি বললেন, 'এখন আমি বৃদ্ধ ও স্থবির হয়ে পড়েছি। পরগনার শাসনভার এবং সৈনিকদের পরিচালনা করতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বেঁচে থাকতেই তোমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করো।'

এই কথা শুনে সুলায়মান ও তার জননী অসন্তুষ্ট হলেন। তারা মিয়া হাসানের কানে ফরিদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কুৎসা তুললো। ভগ্নির বিবাহের জন্য ফরিদ খান কিছু টাকা সুলায়মানের নিকট জমা রেখেছিলেন। কিন্তু সুলায়মান সে টাকা হাসান খানকে দেখিয়ে বললেন যে, ফরিদ খারাপ উদ্দেশ্যেই টাকাগুলো হস্তান্তর করেছে। প্রতিদিন তারা ফরিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলতে লাগলো। কিন্তু মিয়া হাসান কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। সুলায়মান ও তার জননী বুঝতে পারল যে, ফরিদের বিরুদ্ধে কুৎসাও মিয়া হাসানের উপর এতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি বরং হাসান বললেন, 'তোমরা সর্বক্ষণ ফরিদের পেছনে লেগে থাকবে এটা ভারী অন্যায়। তোমরা দু'জন ব্যতীত আমার সৈন্যবাহিনী বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আর কেউ ফরিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও তুলেনি। আমি নিজেও তার কাজকর্মে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট। ফরিদের জন্যই আজ আমার পরগনা দু'টি সমৃদ্ধ।'

মিয়া হাসানের এরূপ উক্তি শুনে সুলায়মানের জননী মুখ বন্ধ করলেন। ফরিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বন্ধ হলেও কিন্তু মিয়া হাসানের সাথে তিক্ততা সৃষ্টি হলো। সুলায়মান জননী সেদিন থেকে খুব অল্পই মিয়া হাসানের সংস্পর্শে যেতেন। স্ত্রীর আচরণে মিয়া হাসান জনসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করতেন। মিয়া হাসানের প্রতি স্ত্রীর পূর্বের ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা শিথিল হয়ে পড়ল। তবুও মিয়া হাসান স্ত্রীর জন্য হৃদয়ের টান হারাননি। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার ম্রিয়মাণ হবার কারণ কি? আমাকে এড়িয়ে চলার কারণই বা কি?' উত্তরে সুলায়মানের জননী বললেন—'একদা আমি ছিলাম তোমার এক নগণ্য বাঁদী। তুমি অসীম ভালবাসা ও স্নেহে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছিলে। তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কিন্তু ঈর্ষাবশত আমাকে ঘৃণার চোখেই দেখে আসছে। এখনও তারা আমাকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য রয়েছে আমিও সাধ্যমত এর থেকে বিরত থেকেছি। ফরিদ তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র। তোমার আসনে সে অধিষ্ঠিত হতে চায়। যদি তুমি জীবদ্দশায় ফরিদের মত আমার পুত্রকেও স্বীকৃতি দিয়ে পরগনা পরিচালনার ভার না দাও তাহলে আমি তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করব এবং আমার পুত্রদের মেরে রেখে যাব। তুমি তোমার জীবদ্দশায় আমার সন্তানকে সম্পত্তির অংশ না দিয়ে গেলে তারা বঞ্চিত হবে ন্যায্য অধিকার থেকে। ফরিদ ও তোমার অমাত্যবর্গ আমার দুশমন। তোমার মৃত্যুরপর তারা আমাদের অপমান করে পরগনা থেকে বিতাড়িত করবে। সুতরাং তোমার মৃত্যুর পর অপমানিত হয়ে শত্রুদের মধ্যে বেচে থাকার চাইতে তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।

মিয়া হাসান ছিলেন স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় অন্ধ, স্ত্রী-প্রণয় তাকে করেছিল নিতান্ত অসহায় (যা থেকে কোন প্রেমিকেরই মুক্তি নেই)। স্ত্রীর প্ররোচণায় প্রভাবিত হয়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি মমত্ব হারালেন এবং ফরিদকে দেশ হতে বিতাড়িত করে অন্য পুত্রকে তদস্থলে স্থলাভিষিক্ত করতে মনস্থ করলেন। সুলায়মানের জননী বললেন, 'তোমার উপর আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। কিন্তু তোমার আত্মীয়-স্বজনরা ফরিদকে শাসনচ্যুত করার ব্যাপারে ঘোর বিরোধিতা করবে।' প্রণয়াভিভূত মিয়া হাসান সংকল্পে অটল থাকার জন্য স্ত্রীর নিকট শপথ গ্রহণ করলেন এবং এভাবে তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

মিয়া হাসান অতঃপর ফরিদের ত্রুটি অনুসন্ধানে রত হলেন, তিনি ফরিদের কার্যাবলী পরীক্ষা শুরু করলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শীঘ্রই ফরিদ বিমাতার নিকট পিতার শপথের কথা জানতে পারলেন। তাকে শাসনচ্যুত করে সৎভাইকে তদস্থলে নিয়োগ করার এই ষড়যন্ত্রের কথা তার কাছে অবিদিত রইলো না। হাসান খান আত্মীয়ের নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। কাজেই ফরিদ শাসনভার পরিত্যাগ করে মিয়া হাসানের নিকট বলে পাঠালেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত পিতার স্নেহ ও আনুকূল্য লাভ করেছি ততক্ষণ আমি পরগনার শাসনকার্য পরিচালনা করেছি। এখন আপনার পছন্দ অনুযায়ী অন্যলোক নিয়োগ করুন। কতিপয় লোক ঈর্ষা ও শত্রুতাবশত আমার বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করছে এবং সে জন্য আপনারা দুঃখিত হয়েছেন। আমি চাই এ ব্যাপারে আমার পিতা প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করুন। আমি আপনাদের কাছে নিজের কথা বলতে চাইনে।'

মিয়া হাসান তদুত্তরে দূত মারফত বলে পাঠালেন, 'অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণও নেই। কেননা আমি সৈন্য বাহিনীর সাথে ছিলাম না। কিন্তু পরগনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির চেষ্টা আমি করেছি। পরগনা তোমার পরিচালনায় দ্বিগুণ শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। তুমি যদি কোন কিছু নিজের স্বতন্ত্র করে রেখে থাকো তবে উত্তম কাজই করেছ। এটা তোমারই সম্পত্তি, তাতে নিন্দনীয় কিছু নেই। সুলায়মান এবং তোমার অন্যান্য অধঃপতিত ভ্রাতা আমাকে অহর্নিশ বিরক্ত করছে। আমি মনে করি শাসনকার্য পরিচালনায় তারা অক্ষম। আমার কোন উপদেশ তাদের প্রভাবিত করে না। তারা আমার শান্তি ও আরামকে হারাম করে তুলেছে। তাদের জননী পুত্রের পক্ষ নিয়ে সর্বদা আমার কাজে হস্তক্ষেপ করছে। এমতবস্থায়, সুলায়মান ও আহমদকে কিছু দিনের জন্য পরগনার সিকদার পদে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি। দিবারাত্রি অহর্নিশ জ্বালাতন পোহানো থেকে নিষ্কৃতি, লাভের জন্যই আমাকে এটা করতে হয়েছে।' ফরিদ পিতার কথা শুনে উত্তর পাঠালেন, 'আপনি পরগনা দু'টির অধিপতির শাসনভার যাকে ইচ্ছে তাকে আপনি দিতে পারেন।'

আত্মীয়-স্বজন জানতে পারলেন যে, মিয়া হাসান পরগনা দু'টির শাসনভার ফরিদের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছেন এবং সুলায়মান ও আহমদকে

তদস্থলে বসাতে চাইছেন। ফরিদ তখন জীবিকার সন্ধানে আগ্রা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল (ঐ সময়ে আগ্রা ছিল দেশের রাজধানী)। তখন তারা হাসানের কাছে গিয়ে বললেন, ফরিদের নিকট হতে পরগনা কেড়ে নিয়ে সুলায়মান ও আহমদকে তা অর্পণ করা ন্যায়-নীতি বিরুদ্ধ। কেননা ফরিদের সুশাসনে দেশ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নতি লাভ করেছে। সে নিজের ক্ষমতা এতখানি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ইতিপূর্বে কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। সে এমন কোন অপরাধ করেনি যে জন্য তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ একজন দক্ষ পুত্রের সংগে তিক্ততার সৃষ্টি করা সমীচীন হবে না। বিশেষত এটা এমনি একটি যুগ সন্ধিক্ষণ যখন সুলতান ইব্রাহীমের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রভাবশালী আফগান রাজন্য স্ব-স্ব এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় শাসন ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সুযোগ সন্ধান করছে।

মিয়া হাসান আত্মীয়-স্বজনদের বললেন, 'আমি জানি ফরিদকে দুঃখ দেয়া সমীচীন নহে। কিন্তু কিইবা আমি করতে পারি? সুলায়মান ও তার জননী প্রতিটি মুহূর্ত আমার পিছনে লেগে আছে। তারা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ...আমি এখন বৃদ্ধ। সর্বদা মৃত্যু হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারি না। আমি জীবিতকালেই সুলায়মান ও আহমদের হস্তে পরগনার শাসনভার ন্যস্ত করছি। তারা যদি সুচারুভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে তবে উন্নতি লাভ করবে। প্রজাবৃন্দ সুখে কালাতিপাত করবে সৈন্যবাহিনী থাকবে সন্তুষ্ট। তাহলে আমার জীবিতাবস্থাতেই তারা সুনাম অর্জন করবে। ফরিদও মানুষের মাঝে সুনাম প্রতিষ্ঠাপূর্বক আমার হৃদয়কে আনন্দিত করে তুলেছে। যেখানেই থাকনা কেন, সে নিজের জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সুলায়মান ও আহমদ যদি ব্যর্থতার পরিচয় প্রদান করে তাহলে আমার জীবিত অবস্থায় মাত্র কিছুদিনের জন্য ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমার মৃত্যুর পর পরগনার শাসনভার ফরিদের হাতেই চলে যাবে। কেননা একমাত্র সেই-ই-এর উপযুক্ত।'

আত্মীয়গণ হাসানের উত্তর শুনে বললেন—'একটা বাঁদীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আপনি ফরিদকে বিতাড়িত করছেন। এ সময় একটি কেনা বাঁদীর খাতিরে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। বিহারের লোহানীদের

কার্যকলাপ হতে প্রতিয়মান হয় যে, তারা সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চায়। ইহা বলা হয়ে থাকে যে, 'নারীকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।' তবু কিন্তু ক্রীতদাসের প্রণয় শৃংখলে আবদ্ধ হাসান খান আত্মীয়-স্বজনের মূল্যবান উপদেশ অগ্রাহ্য করলেন।

পিতার কার্যকলাপে নিরাশ হয়ে ফরিদ খান বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কানপুর হয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। কানপুর আজিম হুমায়ূন শিরওয়ানীর জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তথায় তিনি হুমায়ূনের খির ট সংখ্যক অনুসারী প্রতিপালন করছিলেন। বহু সংখ্যক শিরওয়ানী পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। ফরিদ কানপুর পৌঁছলেন। মিয়া হাসানের সংগে যারা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তারা ফরিদকে সাদর সম্বর্ধনা জানালো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন শেখ ইসমাঈল। ফরিদ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। প্রথমে বললেন যে, তিনি একজন শিরওয়ানী, কিন্তু পরক্ষণে বললেন যে, 'তিনি ফরিদের সমগোত্রীয় একজন শূর। কিন্তু তার জননী হলেন শিরওয়ানী বংশীয়া। ফরিদ তাকে বললেন— আপনি যে 'শূর' একথা বলেন নি কেন? শেখ ইসমাঈল বললেন—'আমি বলিনি যে, আমি শিরওয়ানী। অন্যরা যদি তা বলে থাকে তাতে আমার দোষ কোথায়? ফরিদ শেখ ইসমাঈলকে বললেন—'আমার সঙ্গে আসুন,।' ইসমাঈল ও ইব্রাহীম উভয়েই ফরিদের সহগমন করলেন। ফরিদ বাংলার শাসক কুতুব শাহকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। যে যুদ্ধে ইসমাঈল প্রভূত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভাগ্নেয় হাবীব খান তাঁর ঘরেই অবস্থান করতেন। হাবীব খান কুতুব শাহকে তীরের আঘাতে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু হাবীব খান শেখ ইসমাঈলের শিষ্য, সেহেতু এ হত্যার গৌরব ইসমাঈলেরও প্রাপ্য। ঐ যুদ্ধেই ফরিদ খান শেরশাহ উপাধি লাভ করেন এবং ইসমাঈলকে সুজাওয়াত খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেরশাহ হিন্দুস্থানের সিংহাসন দখল করার পর মান্দ-এর প্রশাসন ভার ইসমাঈলের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। বিপুল যসের অধিকারী ইব্রাহীম খানকেও তিনি সরমাস্ত খান উপাধি প্রদান করেন। ফরিদের আগ্রা গমনের প্রাক্কালে বুধুর (তিনি আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানীর ঘরে লালিত) পুত্র দৌলত খান লাভ করেছিলেন ১২ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব। দৌলত খানকে সুলতান ইব্রাহীমে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ফরিদ খান দৌলত খানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক

হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি এমনি কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেন যে, দৌলত খান প্রায় বলতেন— 'আমি ফরিদের মুখোমুখী হতে লজ্জাবোধ করি। সে যদি আমার নিকট কিছু চেয়ে বসে তবে তার ইচ্ছা পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দ্বিধাবোধ করব না। শুধু তাকে বলতে দাও, সে আমার নিকট কি চায়।'

ফরিদ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, 'দৌলত খান তার প্রতি সন্তুষ্ট। তখন তিনি দৌলত খানের নিকট পত্র মারফত জানালেন—'মিয়া হাসান খান এখন বৃদ্ধ। তিনি ভাল-মন্দ বিচারে অক্ষম এবং হিন্দু ক্রীতদাসীর মোহে অন্ধ। রমণীটি যাই বলে তিনি তাই করেন। পরগনার শাসন কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার প্রয়োজনীয় অনুমতিও রমণীটি হাসান খানের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন। আত্মীয়বর্গ, সেনাবাহিনী ও প্রজাকুল বর্তমান কুশাসনে অসন্তুষ্ট ও অতীষ্ঠ। ক্রীতদাসীর হাতে পড়ে দুই দুইটি পরগনা ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। সুলতান যদি পরগনাদ্বয় আমার হাতে অর্পণ করেন তাহলে আমি ও আমার ভ্রাতা ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে মিয়া হাসানের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ছাড়াও সুলতানের জন্য যে কোন স্থানে যে কোন উপায়ে কাজ করতে প্রস্তুত থকাবো।' দৌলত খান এ অনুরোধ শুনে তাকে উৎসাহ দিলেন এবং বললেন, হৃদয়বৃত্তিতে সর্বদা হবে মহৎ। মিয়া হাসানের প্রকৃত অবস্থা আমি সুলতানের গোচরীভূত করব। হাসানের হাত থেকে পরগনা নিয়ে তোমার হাতে দেবার ব্যবস্থা করব।'

দৌলত খান সুলতানের নিকট মিয়া হাসানের অবস্থা বর্ণনা করে বললেন— 'ফরিদ খান হাসান খানের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মদক্ষ। সে দীর্ঘদিন পরগনাদ্বয় সুচারুরূপে পরিচালনা করেছে। সৈন্যদল এবং প্রজাকুল তার উপর সন্তুষ্ট। যদি পরগনাদ্বয় ফরিদকে অর্পণ করেন তবে সে ভ্রাতার সহযোগিতায় ৫০০ শত অশ্বারোহী নিয়ে আপনার যে কোন আদেশ পালনে প্রস্তুত।' 'সুলতান উত্তর দিলেন—'যে নিজ পিতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে সে অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।' দৌলত খান ফরিদকে খবর জানিয়ে বললেন— 'উত্তরটি স্বয়ং সুলতানের মুখ থেকেই নির্গত হয়েছে। কিন্তু তোমাকে নিরাশ হলে চলবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকলে আমি পরগনা দু'টির শাসন কর্তৃত্ব তোমাকে দেবই। অধিকন্তু তোমার মঙ্গলের দিকে নজর রাখব।' ফরিদ খবর পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কিন্তু দৌলত খানকে সন্তুষ্ট

করার জন্য তিনি তার সংগে কিছুদিন রয়ে গেলেন। দৌলত ফরিদকে অর্থ সাহায্য করলেন। ফরিদকে তিনি যথেষ্ট অর্থ দিতেন বলে কিছু দিনের মধ্যে ফরিদের হাতে কিছু টাকা জমলো।

কিছুকাল পর মিয়া হাসান মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে সুলায়মান পিতার মুকুট স্বীয় মস্তকে ধারণ করে শুভানুধ্যায়ী পরিবেষ্টিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। এমন সময় সদলবলে মিয়া নিজাম তথায় উপস্থিত হয়ে সুলায়মানের মস্তক হতে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে বললেন— 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে এ মুকুট তুমি ধারণ করতে পার না। ফরিদ বিবিধ গুণে গুণান্বিত। সে এখন সুলতানের অধীনে কার্যে নিযুক্ত। তাকে বঞ্চিত করে তুমি মিয়া হাসানের মুকুট মস্তকে ধারণ করছ আল্লাহকে ভয় করছো না, চিরাচরিত আইন ও প্রথা ভঙ্গ করতে একটু লজ্জাও হল না, বিবেকেও বাঁধল না, আশ্চর্য! তুমি একা বিবাদের সূত্রপাত করছো। পিতার জীবদ্দশায় তুমি তোমার মায়ের প্রভাবে ফরিদের উপর যথেষ্ট অবিচার ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছ। পিতার খাতিরে আমি মুখ খুলে কিছু বলতে পারতাম না, অন্যথায় তোমার সংগে আগেই আমার ফয়সালা হয়ে যেত। কিন্তু এখন আর তোমাদের এ আচরণ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। ফরিদের প্রতি অতীতে যে আচরণ করেছ এক্ষণে তা থেকে বিরত হও। বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ কর। কেননা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংগে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া ভয়ানক অন্যায় কাজ। মিয়া হাসান জীবিতকালে পুত্রদের জন্য পৃথক জায়গীরের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক, নিজের প্রভুত্ব করার স্পৃহাকে সংযত কর। কেননা প্রভুত্ব করার অধিকার একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই রয়েছে। যদি দ্বন্দ্ব পরিহার না কর তবে তুমি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, কেউ তোমাকে ভাল বলবে না। বিরোধ তোমাকে শুধুমাত্র দুর্নামের অধিকারী করবে এবং পরগনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।' সুলায়মান বললেন, 'ভ্রাতা যদি আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন তাহলে আমি তার অধীনে কাজ করতে রাযী আছি।'

তারপর মিয়া হাসানের মৃত্যু ও অন্যান্য যাবতীয় খবর জানিয়ে মিয়া নিজাম ফরিদের নিকট চিঠি পাঠালেন। খবর পেয়ে ফরিদ রীতি মাফিক শোকব্রত পালন করলেন। তিনি দৌলত খানের নিকট গিয়ে সুলায়মান

সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা খুলে বললেন। দৌলত খান বললেন—'উদ্বিগ্ন হয়ো না আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, সুলতান তোমারে হাতে পরগনাদ্বয় অর্পণ করবেন। দৌলত খান সুলতানকে মিয়া হাসানের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে পরগনা দু'টির প্রশাসনের সনদ সংগ্রহ করে তা ফরিদের হস্তে অর্পণ করলেন। পরগনায় ফিরে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং পরিবার ও পরিজনদের সান্ত্বনা দান করে পুনরায় সুলতানের দরবারে হাযির হওয়ার জন্য দৌলত খান তাঁকে ছুটি দিলেন। ফরিদ ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজন তার সাথে দেখা করতে এলেন। তারা সকলে শাহী ফরমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। সুলায়মান ফরিদকে বাধা প্রদানে অসমর্থ হয়ে চাউন্দা পরগনার গভর্নর মুহম্মদ খান সুর দাউদ শাহ খাইলের আশ্রয়ে চলে গেলেন। দাউদ শাহ ছিলেন ১৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়ক। মুহাম্মদ খান ও হাসান খানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। হাসান খান নিজদের মধ্যে কলহ করে মুহাম্মদ খানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক এটাই ছিল তার আন্তরিক কামনা। তিনি সুলায়মানকে বললেন--'কিছু দিন ধৈর্য ধরে থাক। কারণ ফরিদ খান সুলতানের ফরমান লাভ করেছে। কিন্তু সুলতান ইব্‌রাহীম সুলতান বহলুল এবং সুলতান সিকান্দারের অমাত্যবর্গের সংগে দুর্ব্যবহার করেছেন। তারা প্রত্যেকেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিজ নিজ জেলায় অবস্থান করছেন। ওদিকে পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্নর খান খানান ইউসুফ খাইল নিজ পুত্র দিলওয়ার খানকে কাবুলে পাঠিয়েছেন সম্রাট বাবরকে হিন্দুস্থানে আনার জন্যে। তিনি এখন মোঙ্গলদের নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন। দুই সম্রাটের মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য। যদি সুলতান ইব্‌রাহীম জয়লাভ করেন তবে তোমাকে তার নিকট যেতে হবে। আমি তোমার পক্ষে নিয়ে তাকে লিখে জানাব যে, ফরিদ যেহেতু মিয়া হাসানের বিরুদ্ধাচারী সেহেতু আপনার শত্রু। মিয়া হাসান যে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন সে কথাটি সুলতানকে লিখে জানাব। ভাগ্য তোমাকে যতটুকু সহায়তা করবে তুমি ততটুকু সাফল্য অবশ্যই লাভ করবে। যদি মোঘলরা বিজয়ী হয় তবে আমি ফরিদের নিকট হতে জোরপূর্বক পরগনা অধিকার করে তা তোমার হাতে অর্পণ করব।' সুলায়মান বললেন---'আমি ফরিদের ভয়েই আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছি। কারণ শূরদের মধ্যে আপনি ছাড়া আপনা জন বজাতে আর আমার কেউ নেই। আমি নিজেকে আপনার হস্তে সমর্পণ করছি।' কিছুদিন পর মুহাম্মদ খান প্রতিনিধি মারফত ফরিদের নিকট

সংবাদ পাঠালেন, 'আমার উপদেশ শ্রবণ কর আশা করি আমার এ মধ্যস্ততার মর্যাদা রক্ষা করবে। আমি তোমাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে ইচ্ছুক। এ মধ্যস্থতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আত্মীয়-স্বজনের নিকট আমাকে লজ্জিত হতে হবে।' ফরিদ উত্তরে লিখে জানালেন—'বাস্তবিকই আপনি মহৎ ও শক্তিমান পুরুষ। আপনি শূর বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান ব্যক্তি। সুতরাং গোত্রের প্রভুত্ব এখন আপনারই অধিকারভুক্ত। প্রকৃত ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে নেই। পিতার জীবদ্দশায় সুলায়মান সর্বদা আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছে। এমনকি পিতার মৃত্যুর পরেও আমি তিন ভাইকে পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর জায়গীর প্রদান করেছি। আমি সুলায়মানকে বলেছি পিতার জীবনকালে আমাদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল এক্ষণে আমরা তার মিটিয়ে ফেলি। আমাদের বাকী জীবন বন্ধুত্ব ও মমতার মধ্যে অতিবাহিত হোক। তাকে আমার কাছে আনবার জন্যে ভ্রাতা নইমকে পাঠিয়েছি। তাকে আমি এমন জায়গীর দেব যাতে সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু পরগনার হিস্যা অর্জনের লোভ থেকে তাকে নিবৃত্ত করবেন। আমি জীবিত থাকতে তা পাবে না। প্রতিনিধি ফরিদের সব কথা মুহাম্মদ খানের গোচরে আনলেন। তখন মুহাম্মদ খান সুলায়মানকে জানালেন—'ফরিদ তোমাকে পরগনার অংশ দেবে না। কিন্তু আমি তা জোরপূর্বকই আদায় করে নেব।'

সুলায়মান অতিশয় আনন্দিত হলেন। কিন্তু ঘটনাটি ফরিদ খান জানতে পারলেন। তিনি ভ্রাতা নিজাম ও অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে পরামর্শ করে বললেন—'মুহাম্মদ খানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির সংগে আমাকে অবশ্যই মৈত্রী স্থাপন করতে হবে। এমনকি ফরিদ খান লোহানীর পুত্র বিহার খান ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি আপাতত উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। সে যাই হোক, কিছুদিন অপেক্ষা করে পরিস্থিতি লক্ষ্য করাই শ্রেয়।

সুলতান ইব্‌রাহীম জয়ী হলে কেউ আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে সক্ষম হবে না। কেননা আমি সুলতানের ফরমান লাভ করেছি। আল্লাহ্ না করুক, সুলতান মোঘলদের হাতে পরাজিত হতে আমাকে অবশ্যই বিহার খানের সংগে মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে' কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া গেল মোঘল ও সুলতান ইব্‌রাহীম পানিপথের প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

ভয়াবহ যুদ্ধে সুলতান প্রাণ হারিয়েছেন। ৯৩২ খৃ. সম্রাট বাবর নিজেকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফরিদ খান বাধ্য হয়ে বিহার খানের নিকট গিয়ে তাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করলেন। ফরিদ দিনের বিশ্রাম ও রাতের আরামকে হারাম করে কঠোর নিষ্ঠার সংগে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার বলে তিনি বিহার খানের মন জয় করে নিলেন। বিহার খান ফরিদের অনুপম কাজ কর্মে বিমুগ্ধ হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে পরিগণিত করলেন। অসাধারণ সাংগঠনিক কর্মকুশলতার জন্য তিনি বিহার খানের প্রশংসাও লাভ করলেন প্রচুর। একদিন ফরিদ খান বিহারের সংগে শিকারে বের হন। সম্মুখে নিপতিত হল একটি প্রকাণ্ড বাঘ। ফরিদ খান এই হিংস্র প্রাণীকে বধ করলেন। সুলতান ইবরাহীমের মৃত্যুর পর বিহার খান 'সুলতান মুহাম্মদ' উপাধি ধারণপূর্বক নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। সমগ্র দেশে তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ দেয়া হল। দুঃসাহসিক কার্যের জন্য তিনি ফরিদকে ভূষিত করলেন শের খান উপাধিতে। ফরিদকে বিহার খানের পুত্র জালাল খানের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

দীর্ঘদিন ফরিদ ডেপুটির দায়িত্ব পালন করলেন। তৎপর ছুটি নিয়ে নিজ পরগনায় কিছুদিন অবস্থান করলেন; শের খানের দীর্ঘ অনুপস্থিতির দরুন সুলতান মুহাম্মদ ফরিদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। এটাই ছিল সে অস্থিরতা আর অবিশ্বাসী যুগের বৈশিষ্ট্য। তিনি বললেন, শের খান শীঘ্রই ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে দীর্ঘদিন যাবত অনুপস্থিত রয়েছে।' বাস্তবিকই সে যুগ ছিল অস্থিরতার যুগ। কেউ কারও উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত না।

মুহাম্মদ খান সুর, সুলতান মুহাম্মদের নিকট এসে ফরিদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বললেন, 'সুলতান সিকান্দারের পুত্র সুলতান মাহমুদের সসৈন্য অভিযানের আশায় ফরিদ এখনও বিভোর। এ জন্যই সে প্রতীক্ষা করছে। সুলতান মাহমুদের সংগে ইতিমধ্যে বহু অবাধ্য আমীর ও আফগান যোগদান করেছে। যদি নির্দেশ পাই তাহলে আমি অনায়াসে ফরিদকে জাঁহাপনার দরবারে হাযির করতে পারি। তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান সুদক্ষ রাজপুরুষ। হাসান খান জীবিত অবস্থায় তাকেই পরগনা প্রশাসনের ভার অর্পণ

করেছিলেন। ফরিদ পিতার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ব্যাধিতে ভুগছিল। এজন্যই সাবেক সুলতান বলেছিলেন, 'নিজের পিতার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি অভিযোগ আনয়ন করতে পারে সে ব্যক্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট।' হাসান খানের মৃত্যুর পর ফরিদ তাঁর পৃষ্ঠপোষক দৌলতখানের সহায়তায় সুলতান ইব্রাহীমের নিকট হতে পরগনাদ্বয়ের ফরমান আদায় করে নিয়ে ছিল। মিয়া হাসান মৃত্যুশয্যা থেকে সুলতান ইব্রাহীম খানের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। তা নিয়ে সুলতানের সংগে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা সুলায়মানের ছিল। কিন্তু নানা গোলযোগে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবে সুলায়মান এক্ষণে ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য আপনার দরবারে হাযির হয়েছে। জাঁহাপনা যদি পরগনায় দু'টি সুলায়মানের হাতে ন্যস্ত করেন তাহলে আপনার সমীপে হাযির হওয়া ছাড়া ফরিদের উপায় থাকবে না। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুলায়মান দীর্ঘকাল আমার আশ্রয়ে বসবাস করছে। সুলায়মান নিজের সঙ্গত অধিকার ফিরে পেলে চিরকাল জাঁহাপনার দাসানুদাস হয়ে থাকবে। সুলতান মুহাম্মদ উত্তর করলেন—'ফরিদ আমার জন্য যথেষ্ট করেছে। সামান্য অপরাধের জন্য বিনা অনুসন্ধানে আমি কিভাবে তার পরগনা অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি? যা হোক তোমার খাতিরেই বলছি। তারা উভয়েই আমার সম্মুখে নিজ নিজ দাবী ও যুক্তি পেশ করুক। তারা দু'জনেই আপনার নিকট সমান। আপনি কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবেন না। তাদের মধ্যকার শত্রুতা দূর করতে হবে।

মুহাম্মদ খান বিদায় নিয়ে নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি গুপ্তচর ও দূত সাদী খান মারফত ফরিদ খানের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন, 'ভাইদের বঞ্চিত করে দু'টি পরগনা আত্মসাৎ করা তোমার পক্ষে সমীচীন হয়নি। এতে তোমাদের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বিবাদের ভিত্তি গড়ে উঠবে। আমি সাদী খানকে তোমার নিকট প্রেরণ করেছি। আশা করি সে যা বলবে তুমি তা প্রত্যাখান করবে না। তোমার ভ্রাতৃবর্গ বহুদিন ধরে আমার কাছে রয়েছে। আফগানদের আইন-কানুন ও প্রথা তোমার কাছে অজানা নয়।'

সাদী শের খানের নিকট মুহাম্মদ খানের মনোভাব ব্যক্ত করলে শের খান উত্তরে বললেন, 'মুহাম্মদ খানকে বলে দিও, এটা রোহ দেশ নয় যে, আমি ভাইদের মধ্যে পরগনা বাটোয়ারা করে দেব। ভারত সম্পূর্ণ রূপেই

সুলতানের অধিকারভুক্ত। এখানে অন্য কেউ সাম্রাজ্যের হিস্যা পাবেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন এর অংশীদার হতে পারে না। সিকান্দার লোদী এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কোন আমীর মৃত্যুবরণ করলে টাকা পয়সা কিংবা অন্যান্য সম্পত্তি আইনানুসারে উত্তরাধিকারীদের ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু প্রশাসন, জায়গীর এবং সৈন্যবাহিনীর ভার ন্যস্ত থাকবে সর্বাপেক্ষা যোগ্য (পিতা যাকে মনে করেন) পুত্রের হাতে। এতে অপর কেউ অংশীদার হতে পারবে না। এ ব্যবস্থার অন্য কোন প্রতিবিধান বা বিকল্প নেই। আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই সুলায়মান অন্যান্য ভাইদের সংগে পিতার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছে। আপনি আত্মীয় বলে আমি কিছুই বলিনি। কিন্তু যখন সে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবে তখন অবশ্যই আমি তার কাছে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর হিস্যা পুনরায় দাবী করব। প্রশাসন ও জায়গীরের ভার আমি সুলতান ইব্রাহীমের কাছ থেকে নিয়েছি। তাতে কারও অধিকার নেই। কিন্তু আমি ভ্রাতাদের বলেছিলাম, পিতার জীবদ্দশায় তোমরা যে জায়গীর ভোগ করেছ তা আমি ছিনিয়ে নেবো না, এমনকি তা বাড়িয়ে দেবারও ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেহ আমার অংশীদার হতে পারবে না।" টাণ্ডা, মালহও পরগনা সুলায়মানের হাতে ছেড়ে দিতে বলা আপনার কিছুতেই উচিত হয়নি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেব না। আপনি যদি জোরপূর্বক সুলায়মানকে ওটা দিতে চান, তা করার সুযোগ অবশ্যই আপনার রয়েছে। কেননা আপনি যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি আর কিছু বলতে চাইনে।'

সাদী ফিরে এসে সব কথা মুহাম্মদ খানকে জানালে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন 'আমার সমগ্র বাহিনী নিয়ে টাণ্ডা মালহও পরগনা দখল করে তা সুলায়মান ও আহমদের হস্তে অর্পণ করতে হবে। ফরিদ যদি তোমাদের প্রতিরোধ করে তাহলে সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সংগে যুদ্ধ করবে। সে যদি পরাজিত হয়ে পলায়ন করে দু'টি পরগনাই সুলায়মানের হাতে অর্পণ করো। সুলায়মানের সহায়তার জন্য আমাদের সৈন্যদলকে তার নিকট রেখে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। ফরিদ যদি তার অল্পসংখ্যক অনুসারী নিয়ে যুদ্ধের জন্য আবার এগিয়ে যায়, তাহলে সুলায়মানই তাকে ঠেকাতে' সক্ষম হবে।

যথাসময়ে এ সংবাদ শেরশাহের কর্ণগোচর হল। ক্রীতদাস 'সুখ' (খাওয়াস খানের পিতা) ছিলেন বেনারসের নিকটবর্তী টাণ্ডা ও মালহর

পরগনা সিকদার। শেরশাহ তার নিকট লিখে জানালেন যে, সুলায়মান সাদী সমভিহারে তাকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন। তিনি চান বিনা প্রতিরোধে টাণ্ডা ও মালহ ছেড়ে না দেন। মুহাম্মদ খানের সৈন্য বাহিনী আগমন করার পর সিকদার তার সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য শহরের বাইরে এগিয়ে এলেন। এক প্রবল সংঘর্ষে সুখ নিহত হলেন। তার বাহিনী পরাজিত হলে সাসারামে শের খানের নিকট পালিয়ে গেল। এমন কি পলায়িত সৈন্যদল সাসারামে এসে একত্র হওয়ার সুযোগ পেল না।

সুলতান মুহাম্মদের সংগে সাক্ষাত করার জন্য কতিপয় ব্যক্তি শের খানকে উপদেশ দিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এখন অনিশ্চয়তার মুহূর্ত। সুলতান আমার খাতিরে মুহম্মদ খানের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবেন না। বড়জোর তিনি আমাদের মধ্যে একটা সমজোতা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় যেতে ইচ্ছুক নই। মিয়া নিযাম খান বললেন, 'তুমি যদি সমঝোতায় যেতে রাযী না থাক তাহলে তোমার পাটনায় গমনই আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ বলে মনে করি। সেখানে বেশ কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তির সহায়তায় আগ্রায় সুলতান জুনা-য়েদ বিরলাসের সংগে সাক্ষাত করে তাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। মুহাম্মদ খানের উপর শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ নয় তাকে চউন্দা থেকে তাকে বিতাড়িত করার সুযোগ সম্ভবত এর মাধ্যমেই আসতে পারে। শেরশাহ এ প্রস্তাবে রাযী হয়ে পাটনায় চলে গেলেন। তিনি সুলতান জুনায়েদের আগ্রা দরবারে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে বললেন, 'সুলতান জুনায়েদ যদি আমাকে আশ্রয় দেন এবং উৎপীড়ন না করার অঙ্গীকার করেন তাহলে আমি তাঁহার অধীনে অনুগত ও একনিষ্ঠভাবে চাকুরী গ্রহণে সম্মত।

সুলতান জুনায়েদ শের খানের এ প্রস্তাবে রাযী হলে প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে শেরশাহ সুলতানের দরবারে হাযির হলেন। জুনায়েদ তার উপর সন্তুষ্ট। পরগনা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত তিনি শের খানকে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রদান করলেন। মুহাম্মদ খান ও সোলায়মান শের খানকে প্রতিহত করতে না পেরে রোটাস পর্বতে পলায়ন করলেন। শের খান শুধু নিজের পরগনাই অধিকার করলেন না, অধিকন্তু চউন্দা এবং সুলতানের অধীনস্থ কতিপয় পরগনাও তার করায়ত্ত হল। পর্বতে আত্মগোপনকারী অনুগত আফগানদের

পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ জায়গীর মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি লিখলেন—'আমাদের রমণীদের মর্যাদা আমাদের সকলের নিকট সমান। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি এবং আমার পরগনা পুনরায় দখল করেছি।' এ আশ্বাসে বহু আফগান শের খানের নিকট ফিরে এল। অধিকাংশ আফগান তাঁর নিকট ফিরে আসায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজের ক্ষমতায় আস্থাশীল হওয়ার পর তিনি সুলতান জুনায়েদের সৈন্যদলকে বিদায় দিলেন। সে সাথে সুলতানের জন্য প্রেরণ করলেন বহুমূল্যে-উপঢৌকন। তারপর শের খান পর্বতে পলায়নকারী চউন্দার প্রাক্তন অধিপতি মুহাম্মদ খান সুরের নিকট এক পত্রে লিখলেন-আপনি মোটেই ভীত হবেন না। নিজের মনকে শান্ত করুন এবং ফিরে এসে আপনার পরগনার ভার পুনরায় গ্রহণ করুন। সুলতান ইব্রাহীমের কাছ থেকে কয়েকটি করদ পরগনা আমি অধিকার করেছি। আত্মীয়-স্বজনের কোন জিনিসের প্রতি আমার মোটেই লালসা নেই। এখন হচ্ছে বিদ্রোহ ও দুর্যোগের সময়। যে-সমস্ত আফগানের আমার সরকারের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রয়েছে তাদের উচিৎ নিজস্ব গোত্র হতে সৈন্য-সংগ্রহ করে নিজের হস্তকে শক্তিশালী করা। এতে তারা নিজের রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং নতুন ভূখন্ড ও জয় করতে পারবে। সুতরাং এক্ষণে আমাদের পূর্বতন সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। চলুন আমরা নিভৃত কন্দরে ভালবাসা ও সহযোগিতার বীজ রোপণ করি। এ বীজ হতেই একদিন বন্ধুত্বের সোনালী ফসল ফলবে। সমঝোতা এলেই আমরা নতুন বন্ধু সংগ্রহে সফল হব। ফলত আমরা মর্যাদা ও উন্নতির শীর্ষতম শিখরে আরোহণ করতে পারব।' পত্র পেয়ে মুহাম্মদ খান পর্বত হতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং চউন্দা প্রভৃতি পরগনার শাসন ভার পুনরায় স্বহস্তে তুলে নেন। তাঁরা পরস্পরকে ক্ষমা করে দিয়ে পূর্বের সমস্ত শত্রুতা ভুলে গেলেন। এভাবে মুহাম্মদ খান শের খানের আজ্ঞাবহ হয়ে যান।

মুহাম্মদ খান সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হওয়ার পর শের খান গেলেন আগ্রার সুলতান জুনায়েদ বীরলাসের দরবারে আগ্রার সুলতানের সহায়তায়। অতঃপর তিনি সম্রাট বাবরের দরবারে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। তিনি চান্দেরীর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন এবং কিছুদিন মোগলদের মধ্যে অবস্থান করে তাদের সামরিক

কলাকৌশল, প্রশাসন পদ্ধতি, আমীরদের চরিত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি প্রায়ই আফগানদের বলতেন 'ভাগ্য সহায়ক হলে আমি সহজেই মোগলদের ভারত থেকে বিতারিত করতে পারতাম,' শের খানের এরূপ কথা বার্তায় আফগানরাও আড়ালে বিদ্রূপ করে বলতো শের খান অহেতুক অহঙ্কার করছে সে এমন কথা বলছে যা তার সাধ্যের বাইরে।'

আমি (আব্বাস), এই ইতিহাসের রচয়িতা অশীতিপর বৃদ্ধ চাচা শেখ মুহাম্মদের মুখে নিম্নলিখিত কাহিনীটি শ্রবণ করেছি।" আমি তাঁর নিজস্ব উক্তিতে ঘটনাটি বিবৃত করছি। সম্রাট বাবরের অপরাজেয় বাহিনীর সংগে চান্দেরী যুদ্ধে' আমি যোগদান করেছি সংগে ছিলেন খানে খান ইউসুফ খাইল। তিনিই বাবরকে ভারতে ডেকে এসেছিলেন। শেখ ইব্রাহীম মরওয়ানী-আমাকে বললেন, 'শের খানের নিকট চল এবং তার অসম্ভব অহঙ্কারের কথা শ্রবণ করো। তার কথা নিয়ে সবাই হাসি তামাশা করছে। আমরা অশ্বারোহণপূর্বক শের খানের নিকট গমন করলাম। আলাপ প্রসংগে শেষ ইব্রাহীম বললেন, মোগলদের বিতাড়িত করে এ দেশ আবার আফগানদের হাতে ফিরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব।' শের খান উত্তর দিলে--শেখ মুহম্মদ, আমি এবং শেখ ইব্রাহীমের মধ্যে যে কথা হচ্ছে তুমি তার সাক্ষী। শুনে রাখ ভাগ্য প্রসন্ন হলে আমি অত্যল্পকালের মধ্যেই হিন্দুস্থান থেকে মোগলদের বিতাড়িত করব। একক যুদ্ধ কিংবা মিলিত যুদ্ধে মোগল আফগানদের চাইতে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। আফগানদের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলেই হিন্দুস্থান তাদের হস্তচ্যুত হয়েছে। মোগলদের সাথে অবস্থান কালে তাদের সমস্ত কার্য কলাপ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। আমি দেখেছি তাদের মধ্যে আইন শৃংখলা বলতে কিছুই নেই। তাদের শাসকগণ পদমর্যাদা ও আভিজাত্যের অহঙ্কারে ব্যক্তিগতভাবে শাসন কার্য পরিদর্শন করেন না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁরা নির্বিঘ্নে আমীর ও উজিরদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এদের কথা ও কার্যক্রমের উপর শাসক সম্পূর্ণভাবে আস্থাশীল। কি রাজন্য কি সৈনিক সকলেই নানাবিধ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। তা কৃষক, সৈনিক কিংবা বিদ্রোহী জমিদার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়েই হোক দুর্নীতি তাদের মজ্জাগত হয়ে পড়ছে। বিত্তশালী ব্যক্তিরা অনুগত হোক আর না-ই হোক অর্থের জোরে

কাজ আদায় করতে চায়। যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও আর্থিক শক্তিহীন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয় না। স্বর্ণ কিংবা অর্থের লোভে তারা শত্রু-মিত্রের প্রভেদ ভুলে যায়। ভাগ্য সহায়ক হলে যে শীঘ্রই দেখতে পাবে এবং শুনতে পাবে যে, আমি কিভাবে আফগান-দের আমার অধীনে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছি। তাদের মধ্যে আমি আর কখনো ফাটল ধরতে দেব না।' ঘটনার কিছুদিন পর শের খান এক জলসায় যোগদান করেছিলেন। উক্ত জলসায় সম্রাট বাবরও উপস্থিত ছিলেন। শের খানের সামনে রেকাবী ভর্তি করে খাদ্যের একটা বিরাট খণ্ড রাখা হয়। উক্ত বস্তু আহারের নিয়ম শের খানের জানা ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি খাপ থেকে তরবারী বের করে খণ্ডটিকে ছোট ছোট বিভক্ত করলেন। অতঃপর চামচের সাহায্যে পরম পরিতৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করলেন। বাবর শের খানের এ' উপস্থিত বুদ্ধিতে বিমুগ্ধ হলেন। সম্রাটের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর মন্ত্রী খলীফা। তিনি মন্ত্রীকে বললেন—'শের খানের উপর নজর রাখবেন। সে অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। তার ললাটে রাজতিলক পরিলক্ষিত হচ্ছে। বহু আফগান আমীরের সাক্ষাত ঘটেছে আমার সংগে। অনেকে শের খানের চাইতেও শক্তিশালী। কিন্তু তাদের কেউ আমার মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। শের খানকে দেখার পর থেকেই আমার মনে এই ভাবোদয় হয়েছে যে, তাকে হাতের মুঠোয় আনতে হবে। কেননা তার মাঝে আমি মহত্ত্ব ও শক্তিমত্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি।' সুলতান জুনায়েদ বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে মন্ত্রী 'খলীফার' কাছে শের খানের ব্যাপারে জোর সুপারিশ করে গিয়েছিলেন। শের খানও তাকে মহামূল্য উপঢৌকন দেন। তাই মন্ত্রী মহোদয় সম্রাট বাবরকে বললেন—'শের খান সম্পূর্ণ নির্দোষ। তার এমন কোন শক্তিশালী বাহিনী নেই যাতে সে জাঁহাপনার আতংকের কারণ হতে পারে। আপনি যদি তাকে বন্দী করেন তাহলে আপনার পক্ষের সমস্ত আফগান সন্দেহ পরায়ণ হয়ে উঠবে। তখন কোন আফগানই আপনার প্রতিশ্রুতিতে আস্থাশীল হবে না। ফলস্বরূপ এক অনৈক্যের সৃষ্টি হবে।' সম্রাট নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু বিচক্ষণ শেরশাহ ঠিকই বুঝতে পারলেন যে, সম্রাট তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রকার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

শেরখান বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করে বন্ধু বান্ধবদের বললেন—'সম্রাট আজ আমার দিকে অনেকক্ষণ যাবত তাকিয়েছিলেন এবং আমার সম্বন্ধে মন্ত্রীর

সাথে কি যেন বলাবলিও করেছেন। তিনি আমার প্রতি বারবার কেমন এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। তাই এখানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করছি না। আমি এখান থেকে অন্যত্র চলে যাব।' অশ্বারোহণপূর্বক তিনি মোগলদের দল ত্যাগ করে চলে গেলেন। মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই শের খান সম্রাটের পরিবারবর্গের নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলেন। সম্রাট তার সন্ধানে লোক প্রেরণ করলেন। অনুসন্ধানকারী শের খানের বাসভবনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু শের খান তখন নাগালের বাইরে। এ খবর পেয়ে সম্রাট বাবর উজীরকে বললেন—'আপনি বাধা প্রদান না করলে আমি তাকে তখনই বন্দী করতাম। সে কিছু একটা করতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ্ জানে কি সে করতে চায়!'

শের খান জায়গীরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সুলতান জুনায়েদের নিকট প্রচুর উপহার সামগ্রী পাঠালেন। জুনায়েদকে তিনি এক পত্রে জানালেন—'সম্রাটের বিনা অনুমতিতে তাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি ছুটি চাইলে তিনি তা মঞ্জুর করতেন না। আমার জায়গীরে ফিরে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি। কারণ আমার ভ্রাতা নিজাম আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, মুহাম্মদ খান ও সুলায়মান মিলে সুলতান মুহাম্মদ খানের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেছে। অভিযোগে তারা বলেছে, আমি মোগলদের সাথে মৈত্রী পাতিয়ে তাদের সহায়তায় পরগনা দখল করেছি। পরগনা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা—সুলতান মুহাম্মদের সহায়তা চেয়েছে। অবশ্য সুলতান মুহাম্মদ কোন উত্তর প্রদান করেন নি। এই সংবাদ পাওয়ার পর সম্রাটের নিকট অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি সম্রাটের একজন কৃতজ্ঞ ভৃত্য। আমি তাঁর ইচ্ছানুসারেই কাজ করে যাব।' অতঃপর শের খান ভ্রাতা নিজামের সংগে পরামর্শ করে বললেন,—মোগলদের উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। আমার উপর তাদেরও কোন আস্থা নেই। আমাকে অবশ্যই সুলতান মুহাম্মদ খানের নিকট যেতে হবে।' পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি বিহারে সুলতান মুহাম্মদের নিকট গমন করলেন। সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কেননা শের খানের মহৎ গুণাবলী সুলতানের অবিদিত ছিল না। তিনি শেরখানকে তদীয় পুত্র আলাম খানের অধীনে নিয়োগ করে বললেন,—'আমি তোমাকে আমার পুত্রের সহযোগী হিসেবে নিয়োগ করলাম। তুমি তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোল। কেননা তার বয়স এখনো অতি অল্প। শের খান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হলেন।

সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জালাল খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল খানের মাতার নাম ছিল দুদু তিনি ছিলেন সুলতান মুহাম্মদের উপপত্নী। জালাল অত্যন্ত অল্প বয়স্ক হওয়ায় রাজমাতা সাম্রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করলেন। শের খানকে বিহার ও অন্যান্য করদ রাজ্যের মন্ত্রী করা হয়। দুদুর মৃত্যুর পর শেরখান জালাল খানের পক্ষে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

শের খানও হাজীপুরের শাসক মখদুম আলমের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। মখদুম ছিলেন গৌড় ও বাংলার একজন আমীর। বঙ্গরাজ মখদুমের উপর রুষ্ট ছিলেন। কারণ বঙ্গরাজ আফগানের হাত থেকে বিহার দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বিহার দখলের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন কুতুবখান। সঙ্গে ছিল এক বিরাট সৈন্যদল। শের খান বারবার এ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ...যা হোক, কুতুবখান এ প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করেন নি। তখন শের খান আফগানদের বললেন—'মোগল এবং বঙ্গদেশ মিলিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। অন্য তরফ থেকেও আমাদের সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। অতএব নিজের বাহুবলে দেশ রক্ষা করতে হবে।' আফগানগণ উত্তরে বললেন—'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা প্রাণপণে লড়বো। হয় গাজী হব নতুবা শহীদ। এর পূর্বে আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দেব না। একদিন যাদের নিমক খেয়েছি তাদের নিকট আমরা অকৃতজ্ঞ হতে পারিনে।' শেরখান কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুকে রুখে দাঁড়ালেন। শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ পরাজয় করতে বাধ্য হল। উক্ত যুদ্ধে শেখ ইসমাঈল বিপুল শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন। কুতুব খানও হাবীবখান কাকার ছিলেন তাঁর সংগে। বঙ্গ বাহিনীর অধিনায়ক কুতুব খান শরাঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূপাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। শেখ ইসমাঈল বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন। শের খান তাকে দিলেন সুজাওয়াত খান উপাধি। যুদ্ধে যে সমস্ত ধন-সম্পদ, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি হস্তগত হল শের খান তার এক তিলও লোহানীদের মধ্যে বিতরণ করলেন না। এভাবে তিনি হলেন প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী।

এতে লোহানিগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল। শীঘ্রই শের খানের সঙ্গে তাদের শুরু হল শত্রুতা। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে শের খানের বিরুদ্ধাচারণ করল না। উক্ত যুদ্ধে মখদুম আলম কুতুব খানকে সাহায্য করেন নি।

তাই মখদুমের উপর নেমে এল দুর্দশা। বাংলার অধিপতি মখদুম খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন।

আমি আব্বাস খান (তোহফা-ই-আকবর শাহী নামক বর্তমান গ্রন্থের লেখক) আমার কয়েক পুত্র শের শাহের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছিল। শেরশাহ তন্মধ্যে মিয়া হাসনুকে 'দারিয়া খান' উপাধি প্রদান করেন। শের খানের আমীরদের মধ্যে কেউ দারিয়া খানের সমকক্ষ ছিল না। শের খানের সহোদর ভগ্নির সংগে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দরিয়া-খান শেরখানের রাজত্বের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করে। মখদুমের ঘটনা সম্পর্কে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ—শের খানের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন হেতু তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি ছিলাম ওয়াকেবহাল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, লোহানীদের সঙ্গে শত্রুতাবশত শেরশাহ মখদুম আলমকে প্রত্যাক্ষভাবে সহায়তা করতে অপরাগ ছিলেন। কিন্তু তিনি মিয়া হাসনু খানকে মখদুমের সহায়তার জন্য প্রেরণ করলেন। মখদুম আলম তার পার্থিব সমস্ত সম্পত্তি শের খানের নিকট সমর্পণ করে বললেন—বিজয় লাভ করলে আমি সকল সম্পত্তি তোমার নিকট হতে ফিরিয়ে নেব। যদি পরাজিত হই তাহলে অন্যের পরিবর্তে এগুলো তোমারই অধিকারভুক্ত হবে।' মখদুম আলম যুদ্ধে নিহত হলেন। কিন্তু মিয়া হাসনু খান জীবিত অবস্থায় ফিরে এলেন। মখদুম আলমের সমস্ত সম্পত্তি শের খানের হস্তগত হল। শের খান ও লোহানীদের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা শের খানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা পরস্পর পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে বলাবলি করল, শের খান অল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে প্রতিদিন জালাল খানের আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। জালাল খান অসুস্থ, আমাদের এরূপ ভান করতে হবে এবং অসুস্থতার মিথ্যা খবর শের খানের নিকট পাঠাতে হবে। শের খান জালাল খানকে দেখার জন্য প্রাসাদের অভ্যন্তরে গমন করবে প্রত্যাবর্তন করার সময় সে একটি সিংহদ্বার অতিক্রম করে অন্য সিংহদ্বারে পৌছার পূর্বেই আমরা তাকে হত্যা করব।' বলাবাহুল্য এ ষড়যন্ত্রে জালাল খানও জড়িত ছিলেন।

লোহানীদের মধ্যে শেরখানের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবও ছিল। তারা এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে শের খানকে হুশিয়ার করে দিল। অবশ্য লোহানীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিচক্ষণ শেরশাহ এ ষড়যন্ত্র

সম্বন্ধে পূর্বেই অনেকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি বিধায় এ ব্যাপারে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু নিজের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করলেন। আপন লোকদের তালিকা প্রস্তুত করে তিনি তাদের মধ্যে সম্প্রতি অধিকৃত ভূখণ্ড ও সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে দিলেন। তারা মনের মত জায়গীর ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ পেল। কিন্তু লোহানিগণ শের খানের নিকট থেকে কিছুই পেল না। শের খান বুঝতে পারলেন তিনি এত অধিক সংখ্যক নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেছেন যে, লোহানিগণ তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে কিংবা কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না, তখন তিনি লোহানিদের প্রতি শত্রুতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে জালাল খানের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি ভালভাবেই জানেন যে, বিহার রাজ্য আক্রমণ করার জন্য বঙ্গাধিপতি জরুরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। লোহানিগণ তিন-চার পুরুষ যাবত জায়গীর ভোগ করে আসছে এবং আরাম-আয়েশে কালাতিপাত করছে। এমন কি নতুন অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রতিও তারা লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। আপনার একান্ত হিতৈষী হিসেবে আমি মনে করি, নতুন লোককেই সম্প্রতি অধিকৃত সহায়-সম্পত্তি দেয়া সমীচীন হবে। এতে আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু শত্রুপক্ষ (বঙ্গরাজ) আমাদের বিশাল বাহিনী দেখে বিহার আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করবে। এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেই লোহানিগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট। আমার বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ। তারা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঈর্ষাবশত তারা আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করেন তবে আমি যা করেছি তা সমর্থন করবেন এবং লোহানীদেরকে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা হতে নিবৃত্ত করবেন। তাদের কোন কথায় আপনি কর্ণপাত করবেন না। আপনি জানেন, লোহানিগণ শুরদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী। আফগানদের প্রথা হল অন্যের চাইতে কোন গোত্রের চারটি লোকও যদি বেশী থাকে তাহলে তারা প্রতিবেশীকে হত্যা কিংবা আক্রমণ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এখন দুর্যোগপূর্ণ কাল। আপনি কি নিজের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন নন? লোহানিগণ আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আজ থেকে আমি অত্যন্ত সতর্কভাবেই আপনার কাছে আসবো। আমি প্রাসাদ অভ্যন্তরে যেতে পারব না। এজন্য আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে তবে আমি যাবই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে কড়া প্রহরার মধ্যে প্রাসাদে গমনের অনুমতি দিতে হবে।'

৩—

জালাল খান ও লোহানিগণ বুঝতে পারলেন যে, শের খানের নিকট তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং জালাল খান শের খানকে বললেন—'লোহানীদের এমন কি শক্তি রয়েছে যে, তারা তোমার বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করতে পারে? সমস্ত আফগান গোত্র জানে যে, লোহানিগণ মিথ্যাবাদী লোক, সতর্কতা কিংবা দূরদর্শিতা বলতে তাদের কিছুই নেই। তারা রসনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে অক্ষম। যা মুখে আসে তারা তাই অবলীলাক্রমে বলে যায়। কিন্তু কথানুযায়ী কাজ করে না। অনুচরবর্গ নিয়ে তুমি আমার কাছে চলে আস। যেভাবে তুমি নিজেকে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত মনে কর সেভাবেই আসতে পার। তুমি যা করতে চাও আমি তাতে রাযী।'

সম্পূর্ণরূপে আশ্বাস দিয়ে তিনি শের খানকে বিদায় দিলেন। কিন্তু এর পর শের খান ও লোহানীদের মধ্যে আবার ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তবে এ সময়ে লোহানীদের মধ্যে অনৈক্যের সূত্রপাত ঘটে। একদল শের খানের পক্ষ অবলম্বন করে। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে কোন্দল শুরু করলো। বহু সংখ্যক লোহানী শের খানের উপর আস্থা প্রকাশ করে শপথ নিল। কিন্তু শের খান বললেন, 'আমি জালাল খানের অধীনে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে স্থির প্রতিজ্ঞ। তার পিতামাতার নিকট হতে আমি করুণা লাভ করেছি। শৈশব কাল থেকেই আমি তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি—এটা সে ভালভাবেই জানে।'

যে সকল লোহানী শের খানের দলে ভিড়েছিল তারা উত্তরে বলল, 'আপনি যা ভেবেছেন তা অত্যন্ত উত্তম, কেননা আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুতার উদ্ভব হয়েছে তা এভাবে চলতে দেয়া উচিত নয়। শের খান তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,—'নিজের নিরাপত্তা ও জালাল খানের মঙ্গলার্থে আমি যে পরিকল্পনা নিয়েছি তা হল আমি জালাল খানকে বলব, 'তোমার সম্মুখে দু'টি পন্থা রয়েছে। প্রথমটি হল, তোমার শত্রু বঙ্গাধিপতিকে প্রতিহত করা। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙখলা অক্ষুণ্ণ রেখে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা।' লোহানিগণ উত্তর দিল, 'এখন রয়েছে আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী। বিদ্রোহী এবং কুমতলববাজ লোকদের লালন করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি জালাল খানকে জানিয়ে দিন যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বিতাড়িত করে তদস্থলে অন্য সৈনিকদের জায়গীর

প্রদান করতে হবে।' শের খান উত্তর দিলেন, 'নিজের নিরাপত্তা বিধানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজেকে বিপদাপন্ন করে অন্যের সংগে স্থায়ী শত্রুতা জিইয়ে রাখা কিছুতেই সমীচীন হবে না।' উপস্থিত সকলেই তাঁর কথায় সম্মতি প্রদান করল। শের খান অতঃপর জালাল খানের নিকট লিখলেন, 'সুলতান মুহাম্মদ যখন আমাকে আপনার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন তখন ঈর্ষাপরায়ণ লোহানিগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুলতান মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আপনার জননী রাজ্য শাসনের ভার আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করেন, এতে তাদের ঈর্ষা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে আমার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে। কিন্তু আমি সকল প্রকার কলুষ-কালিমা ও অসাধু পন্থা থেকে মুক্ত ছিলাম। তারা অনুসন্ধান চালিয়েও আমাকে পদ থেকে অপসারিত করার মত কোন ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেনি। তরবারির জোরে নয় বরং আফগানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগেই মোগলেরা সুলতান ইব্রাহীমের নিকট হতে সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। আমি বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি, লোহানিগণ আমাকে হত্যা করতে বদ্ধ-পরিকর। অহর্নিশ তারা আমার ইহলীলা সাঙ্গ করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। তারা নিজ গোত্রের সংখ্যাধিক্যের জন্য স্পর্ধা প্রকাশ করছে। আপনার মাত্র দু'টি পথ রয়েছে—প্রথমত, আপনার শত্রু বঙ্গরাজকে প্রতিহত করা। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শত্রু থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করে কর সংগ্রহে মনোযোগ দেয়া। আপনার সৈন্যদল দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উভয় পক্ষকে একই স্থানে একত্রিত রাখা অসম্ভব। সুতরাং আপনার খুশীমত একদলকে সঙ্গে রেখে অন্যদলকে জায়গীরে পাঠিয়ে দিন। এসব কথা আপনাকে জানিয়ে দেয়া আমার অবশ্য কর্তব্য। একটি লোকের নিকট তার জীবন অত্যন্ত প্রিয়। কোন কিছুই বিনিময়ে সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পারে না।'

এই পরামর্শ জালাল খানের নিকট পেশ করার পর তিনি শের খানের দূতকে বললেন,—'শের খানকে বলে দিও, তার উপদেশ দানের অধিকার রয়েছে তবে তাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, কেননা আমার বিরুদ্ধে রয়েছে শক্তিশালী শত্রু। এ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দমন করতেই হবে। আমি মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য নির্ণয় করবই।' জালাল খানের উত্তর অবগত হওয়ার পর শের খান আবার লিখলেন,—'জাঁহাপনা যেসব কথা বলেছেন সবই সত্য, আপনি যা করবেন আমি মেনে নেব। আপনার কোন আদেশ আমি লংঘন করব না।'

এরপর যেসব লোহানী শের খানকে হত্যা করতে চেয়েছিল জালাল খান তাদের ডেকে পাঠালেন। তিনি লোহানীদের শের খানের প্রেরিত চিঠি খানা দেখিয়ে বললেন, 'হত্যার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত কতিপয় লোহানী শের খানের নিকট সমস্ত কথা ফাঁস করে দিয়েছে এবং তার সঙ্গে যোগদান করেছে। সুখে-দুঃখে পরস্পরের সংগে অবিচ্ছেদ্য থাকার শপথও গ্রহণ করেছে। এখন কি করা যায়?' জালাল খানের স্বপক্ষের লোহানিগণ বললেন,— শের খান আমাদের ষড়যন্ত্র জানতে পেরেছে বলে আমরা মোটেই পরোয়া করি না। কিন্তু আমাদের বহু ভাই তার সংগে হাত মিলিয়েছে এটাই সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা। এতে আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে। আপনি শের খানকে তার জায়গীরে পাঠিয়ে দিন। সে থাকুক সেখানে। আপনি প্রফুল্লচিত্তে বঙ্গাধিপতির নিকট গমন করুন। আপনি আপনার জন্য বাংলাদেশে একটি জায়গীর নিন এবং অপর কেউ বিহার অবরোধের চেষ্টা গ্রহণের পূর্বেই তা বঙ্গাধিপতিকে উপহারস্বরূপ প্রদান করুন। এ উপদেশ জালাল খানের মনঃপুত হল। তিনি তৎক্ষণাৎ শের খানকে লিখে জানালেন, 'যে সমস্ত লোহানী তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করছে তাদের আমি শাস্তি প্রদান করব। মোগলদের প্রতিরোধ ও রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার ভার তোমার উপরই অর্পিত হল। আমি বাংলা অভিযানে বের হচ্ছি।' শের খান এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। জালাল খান তাঁর জন্যে অশ্ব ও সম্মানসূচক পোশাক দানপূর্বক দূতকে তৎক্ষণাৎ গন্তব্যস্থলে পাঠালেন। শের খান তাঁর শাশারামের জায়গীরে পৌঁছার পর জালাল খান বাংলা অভিমুখে গমন করলেন। তিনি কুতুব শাহের পুত্র ইব্রাহীমের অধীনস্থ সৈন্যদলের সংগে মিলিত হলেন। জালাল খানের বাংলা গমনের সংবাদে শের খান অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে বললেন—'এখন বিহার রাজ্য আমার করায়ত্ত। কেননা জালাল খানের সৈন্যদলের মধ্যে লোহানিগণ দ্বিধা-বিভক্ত। তাছাড়া আমার সংগে শত্রুতা তো আছেই। কাজেই আমার শত্রু পক্ষের বিজয় লাভের কোন আশা নেই। দ্বিধা-বিভক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে লোহানীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এখন অধিকাংশ লোহানী বাংলায় গমন করেছে। তাছাড়া আমার দলের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। বঙ্গবাহিনী আমাদের সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে এঁটে উঠতে সক্ষম হবে না। এমনকি মোগলরাও আমার আফগান বাহিনীর সমকক্ষ হতে পারবে না। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আমি যদি বঙ্গবাসীকে পরাজিত করতে পারি

তাহলে দেখবে কিভাবে আমি মোগলদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করি।' তারপর শের খান নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অধিক সংখ্যক লোককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করলেন। যেখানে যত আফগানের সন্ধান পাওয়া গেল সবাইকে তিনি চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিয়ে নিজদলে ভিড়াতে আরম্ভ করলেন। এভাবে তার ক্ষুদ্রবাহিনী বিরাট বাহিনীতে পরিণত হলো। তার প্রস্তুতিতে ত্রুটি ছিল না। সমগ্র বাহিনীর শুভেচ্ছা নিয়ে বিহার রাজ্য পেছনে ফেলে তিনি বাংলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযাত্রা শুরু করলেন। মাটির তৈয়ারী প্রাচীর দিয়ে অবস্থানের জন্য দুর্গ নির্মাণ করলেন।

বংগাধিপতি ইব্রাহীম খানকে নিজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে বিহার বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। ইব্রাহীম খানের সংগে ছিল বিরাট বঙ্গবাহিনী, অসংখ্য রণহস্তী ও বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র (আতশবাযী)। ইব্রাহীম খান অহংকারের আতিশয্যবশত শের খানের বাহিনীকে সম্পূর্ণ-রূপে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল। শের খান পরিখার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে প্রতিদিন খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ইব্রাহীম খানের বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করেও মাটির প্রাচীরের জন্য কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হল না। আফগান বাহিনী অসম সাহসিকতার পরিচয় দান করল এবং বঙ্গবাহিনীর প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করল। ইব্রাহীম খানের বাহিনী উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে সক্ষম হল না। বঙ্গ বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে অতি আস্থাশীল ইব্রাহীম খান বুঝতে পারলেন যে, এই যুদ্ধে তাঁর বাহিনী আফগানদের সংগে পেরে উঠবে না। শুধুমাত্র নিজেদের সংখ্যাধিক্য, রণহস্তী ও অস্ত্রশস্ত্রের উপরে ভরসা করেই এতদিন পর্যন্ত তিনি বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে লড়েছেন। অবশেষে নতুন সৈন্যদল প্রেরণের জন্য তিনি বঙ্গাধিপতির নিকট অনুরোধ জানালেন। তিনি লিখে পাঠালেন যে, শের খান সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সৈন্য-বাহিনী দিয়ে তাকে কাবু করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

ইব্রাহীম খানের নতুন সৈন্যদল পাঠানোর অনুরোধের কথা শুনে শের খান আফগানদের ডেকে বললেন—'আমি এতদিন বাঙ্গালীদের সংগে প্রকাশ্য মাঠে যুদ্ধ করিনি, পরিখার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে মাত্র কয়েকজন

সৈনিককে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছি। পাছে তারা শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য দেখে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে--এই আশংকায় আমাকে অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমর নৈপুণ্যে বিপক্ষদল আফগানের চাইতে পশ্চাৎপদ। সরাসরি যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমি কিছুদিন পরিখার মধ্যেই অবস্থান করেছি, যাতে উভয় পক্ষের তুলনামূলক শক্তি সম্পর্কে বাঙ্গালীদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং তাদের নিজ শক্তি সম্পর্কে দম্ভ তিরোহিত হয়ে যায়। সৈন্যবাহিনীর স্বল্পতার জন্য আফগানদের আর নিরুৎসাহিত হতে দেয়া যাবে না। আমি সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যথায় শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ ও ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। এরূপ যুদ্ধে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আফগানদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আফগানদের সামনে টিকে থাকা বঙ্গবাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমার সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। পাক কালামে রয়েছে, আল্লাহ্ সহায় থাকলে সংখ্যালঘিষ্ঠদল সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাহিনীর উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারে। তোমরা যদি সম্মত থাক তাহলে আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ ও উক্ত বাণীর উপর পরি-পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আমি আগামীকালই সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবো। এ ব্যাপারে কোনরূপ বিলম্ব কিংবা পিছিয়ে পড়া সমীচীন হবে না। কেননা অচিরেই শত্রুপক্ষের সংগে নতুন সৈন্যদল এসে যোগ দেবে। আফগানগণ উত্তর দিলেন, আপনার মহৎ হৃদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা যথার্থ।'

শের খান দেখলেন, আফগান বাহিনী বাঙ্গালীদের আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অপরপক্ষে ইব্‌রাহীম খানও ভাবছেন শের খান আর কতদিন এভাবে পরিখায় আত্মরক্ষা করবেন। তিনি সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন। তাঁর ধারণা, বঙ্গবাহিনী আফগানদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তিনি শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষার কোন উপায় অবশিষ্ট রাখেন নি। শের খান সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি ইব্‌রাহীম খানের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে পরদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার খবর পাঠালেন। এদিকে শের খান এখন পরিখার বাইরে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এ সিদ্ধান্তের কথা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও প্রকাশ করলেন। তারা সকলেই শুনে সন্তুষ্ট হল। শের খান ইব্‌রাহীমের নিকট দূত মারফত আরও জানালেন যে, আপনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, পরিখার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আস, খোলা মাঠে উভয়ের শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক, আমি

বিশেষ কারণে ধৈর্য ধারণ করে কিছুদিনের জন্য পরিখার মধ্যে অবস্থান করেছি। ভেবেছিলাম আপনাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা যাবে। কিন্তু আপনারা শান্তির পক্ষপাতী নন। আগামীকাল প্রত্যুষে আপনার বাহিনীকে প্রস্তুত রাখবেন, আমি আপনাদের সংগে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই।' ইব্রাহীম খান দূতকে প্রতি উত্তরে বললেন, 'তোমাদের সমগ্র বাহিনীকে আগামীকাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাযির রাখবে।' এই উত্তর পেয়ে শের খান অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি এ সংবাদ নিজ বাহিনীকে জানিয়ে দিলেন। অপরপক্ষে সমগ্র বাহিনীর সমরায়োজন সম্পূর্ণ করে প্রত্যুষে যুদ্ধক্ষেত্রে হাযির করার জন্য ইব্রাহীম খান ফতেহ খানকে নির্দেশ দিলেন। রজনীর এক প্রহর অবশিষ্ট থাকতেই শের খান ব্যূহ রচনা করে সৈন্যদলকে পরিখার বাইরে আসার নির্দেশ দিলেন। ফজর নামাযের পর তিনি নিজেই বেরিয়ে এসে অধিনায়কদের বললেন, 'শত্রু পক্ষের হাতে বহু হস্তী, বন্দুক ও বিশাল পদাতিক বাহিনী রয়েছে। আমাদের এরূপভাবে যুদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতি বজায় রাখতে সক্ষম না হয়।' শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে বন্দুক ও পদাতিক বাহিনীর নিকট হতে সরিয়ে আনতে হবে। সুকৌশলে হস্তী ও অশ্বকে পরস্পর মিশ্রিত করে দিতে হবে যাতে যুদ্ধের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালী-দের পরাজিত করার একটি রণকৌশল আমি উদ্ভাবন করেছি। আমাদের সৈন্যবাহিনীর বেশীরভাগ সৈন্য আমি পিছনে সরিয়ে আনব। কিন্তু আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুসংখ্যক অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী সৈন্য সম্মুখে অবস্থান করবে। তারা পূর্বের ন্যায় অপরাজেয় মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। আমি বাছাই করা সৈন্যদলকে নিয়ে বঙ্গবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছু হটে আসব। ইব্রাহীম খানের মনে এখনো পিতার মৃত্যু সম্পর্কিত জাতক্রোধ সজীব রয়েছে, অধিকন্তু নিজ বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের গর্বেও তিনি এখনও গর্বিত। তিনি ভাববেন যে, আফগানরা পালিয়ে যাচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে তিনি গোলন্দাজ বাহিনী পরিত্যাগ করে তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবেন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি নিজ বাহিনীর মধ্যে পূর্ব বর্ণিত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে পাবেন। তারপর আমি নির্ধারিত অবস্থান হতে নেমে শত্রু বাহিনীকে পিছন থেকে তীব্র বেগে আক্রমণ করব। এভাবে বঙ্গবাহিনীর অশ্বারোহী দল পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ফলে আফগান অশ্বারোহীর সংগে কুলিয়ে উঠতে

পারবে না। আশা করি আল্লাহ্‌র অপার করুণায় শত্রুপক্ষ নির্মূল হয়ে যাবে কিংবা পলায়ন করবে।' আফগানরা শের খানের রণনীতিকে সমর্থন এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল যে, এর চেয়ে উত্তম যুদ্ধ-কৌশল উদ্‌ভাবন করা সম্ভব নয়।

শের খান পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাছাই করা কিছু সৈন্য সারিবদ্ধ করে তাদের উদ্দেশে সমর কৌশল ব্যাখ্যা করলেন। অবশিষ্ট সৈন্যকে পরিখার আড়ালে নিয়ে এলেন। ইব্‌রাহীমের বাহিনী দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আফগান বাহিনী পূর্বের নির্দেশ মুতাবিক অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের উপর সমবেতভাবে শর নিক্ষেপ করে পুনরায় যথাস্থানে ফিরে গেলেন। ইব্‌রাহীমের অশ্বারোহী বাহিনী মনে করল যে, আফগানরা পালিয়েছে। তাই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করল। শের খান দেখতে পেলেন শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী গোলন্দাজ ও পদাতিক দলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। তখন তিনি লুক্কায়িত সৈন্যদলকে সাথে নিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেলেন সামনে। বঙ্গবাহিনী আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। যেসব আফগান সৈন্য পালিয়েছিল তারাও এসে শের শাহের সংগে যোগ দিল। তারা আফগান সমর পদ্ধতি অনুযায়ী দলে দলে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে বঙ্গবাহিনী পুনরায় একত্রিত হয়ে আবার নিজেদের অবস্থান রচনা করল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। বহুসংখ্যক সৈন্য হতাহত হওয়ার পর বিজয়ের রবি উদিত হলো শের খানের ভাগ্যে। বঙ্গবাহিনী পরাজয় বরণ করল। অবশ্য ইব্‌রাহীম খান প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজ বাহিনীকে বললেন, 'তোমরা রুখে দাঁড়াও এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাও। আফগান বাহিনী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমরা কিভাবে বঙ্গাধিপতির নিকট এ মুখ দেখাব।' কিন্তু সবই নিষ্ফল।

ইব্‌রাহীম খান পুনর্বার তার বাহিনীকে বললেন, 'আমি কিভাবে রাজাকে মুখ দেখাব? আমি জয়ী হব নতুবা মৃত্যুবরণ করব।' তিনি কঠোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তিনি নিহত হলেন।

জালাল খান বাংলার দিকে পলায়ন করলেন। সমগ্র ধন-ভাণ্ডার, হস্তী ও অস্ত্রাগার (তোপখানা) শের খানের হস্তগত হল। তিনি বিহারসহ আরও কতিপয় ভূখণ্ডের প্রভুত্ব লাভ করলেন। এটা পরম পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলারই

হুকুম যে, শেরশাহ হিন্দুস্থানের প্রভুত্ব লাভ করবেন, আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁর ন্যায় বিচারের সুশীতল ছায়াতলে সুখে-স্বাচ্ছন্দে কালাতিপাত করবে। তিনি একজন ন্যায়-নিষ্ঠ উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুতরাং তাঁর ধন-সম্পদ দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কালক্রমে তিনি সমগ্র দেশের মালিকানা লাভ করেন। তিনি দেশের উন্নতি বিধানকল্পে আত্মনিয়োগ করলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই দেশের পূর্বাবস্থার পরিবর্তন ঘটল, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে দেশ ভরে গেল। তিনি শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। অত্যাচারী ব্যক্তি আত্মীয় হলেও তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি। কোন ব্যক্তি তাঁর অধীনে চাকরি গ্রহণ করলে তিনি সর্বপ্রথম বলে দিতেন, 'যে পরিমাণ বেতন কিংবা ভাতা দেয়ার অঙ্গীকার করেছি আমি তা পূর্ণভাবেই দেব। কিন্তু তোমরা অত্যাচার কিংবা কারও সংগে বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে না। আমার আদেশের অন্যথা ঘটলে তোমাদের এমন শাস্তি দেব যা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।' মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রজা-সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। একথা প্রত্যেকের জানা ছিল যে, শের খান সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত বেতন প্রদান করেন। তিনি নিজে কাউকে অত্যাচার করতেন না কিংবা অন্যকে অত্যাচার করার সুযোগও দিতেন না।

আমি আব্বাস খান শিরওয়ানী বিন শেখ আলী শিরওয়ানী (এ গ্রন্থের লেখক) আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট, (যারা শের খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সহচর ছিলেন) শের খান কর্তৃক দুর্গ অধিকারের নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনেছি ঃ সুলতান ইব্‌রাহীম লোদীর চুনার দুর্গের ভার অর্পণ করেছিলেন তাজ খানের হস্তে। রাজকীয় বৈভব উক্ত দুর্গের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল। তাজ খান স্ত্রী মালিকার ভালবাসার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজ সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মালিকা ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতি মহিলা। তাজ খান মীর আহমদ, ইসহাক ও মীরদাদ নামক তিনজন তুর্কীকে সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। তারা ছিলেন সহোদর ভাই। তিন ভাই অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমায় ছিলেন অসাধারণ। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাজ খান সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর বশীভূত। তাই তারা মালিকার অনুগ্রহ লাভের জন্য তৎপর হন এবং তাতে তাঁরা কামিয়াব হন। এক পর্যায়ে তাঁরা মালিকার বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সর্ব প্রযত্নে মালিকার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

মালিকা ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তাজ খানের অন্য পক্ষের কয়েকটি পুত্র সন্তান বর্তমান ছিল। মালিকার প্রতি মহাব্বতে তিনি পুত্রদের উপযুক্ত-ভাবে ভরণপোষণ করতেন না। এমন কি তাদের মাতাদের দৈনিক আহার্যের ব্যবস্থাও করা হতো না। পুত্ররা প্রায়ই এর প্রতিবাদ করত। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। সুতরাং মালিকাকে তারা ঘৃণা করত ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ ছড়িয়ে যেত। একদিন তাজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছোরার আঘাতে মালিকাকে আহত করল। কিন্তু আঘাত তত মারাত্মক হয়নি। মালিকার ভৃত্য তাজ খানের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তাজ খান তরবারি নিষ্কষিত করে পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। পিতা স্ত্রীর খাতিরে তাকে খুন করতে এসেছেন, তাই ক্রোধান্বিত জ্যেষ্ঠ পুত্র তাজ খানের দেহে ছোরার আঘাত হেনে গৃহ থেকে পালিয়ে গেল। তাজ খান সে আঘাতেই মৃত্যুবরণ করলেন।

তাজ খানের পুত্রদের সংগে সৈন্যদলের এক বিরাট অংশের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু চতুর মালিকা সদয় ব্যবহার ও বদান্যতার বলে তাজ খানের জীবিতাবস্থায় সৈনিকদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। স্বামীর মৃত্যুর পরও সৈন্যবাহিনী তার অনুগত থাকে। কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাজ খানের পুত্রদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। কিন্তু তারা টাকা-পয়সা নিয়ে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। এতে পুত্রদের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়লে অনুসারীরা তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং শের খান গোপনে মীর আহ-মদের নিকট এই মর্মে খবর পাঠালেন— 'আমার কাছে মীর দাদকে পাঠিয়ে দাও। আমি তার মারফত তোমার কাছে একটি খবর পাঠাব। মীর আহমদ শের খানের নিকট মীর দাদকে পাঠালেন। শের খান তাকে বললেন,—'মীর আহমদকে বলবে যে, আমি তাকে বিরাট লাভজনক কিছু দিতে প্রস্তুত।' মীর আহমদ একথা শুনে ভাইদের ডেকে বললেন— 'শাসন পরিচালনার মত প্রজ্ঞা মালিকার রয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি একজন মহিলা। দুর্গ ও এর সঞ্চিত সম্পদের উপর অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে। এ দুর্গ রক্ষা করা মালিকার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং শের খানের নিকট দুর্গ সমর্পণ করাই উত্তম। এতে তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন, পরিণামে আমরা লাভবান হব।' ভ্রাতাগণ মীর আহমদের উপদেশ সমর্থন করলেন। তারা মালিকা বেগমকে শের খানের পত্রটি দেখিয়ে বললেন,—'আমরা আপনার বাধ্যগত, আপনি যা নির্দেশ দেবেন

আমরা তা প্রতিপালন করব।' মালিকা উত্তর দিলেন---'আপনারা একাধারে পিতা ও ভ্রাতার মত। আপনারা যা বলবেন আমি তাতেই সম্মত আছি।' তাঁরা বললেন,—'রাগ না করলে আমরা আপনাকে একটা প্রস্তাব দেব। আপনার জন্য তা সর্বাপেক্ষা উত্তম বলেই আমরা মনে করি।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যা বলতে চান স্বচ্ছন্দে বলুন।' মীর আহমদ বললেন,—'দুর্গে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না থাকলেও আপনি তা রক্ষা করতে পারবেন না। কেননা আপনি একজন মহিলা, তদুপরি নিঃসন্তান। দুর্গ অধিকার করার জন্য অনেক লোকই ওঁৎ পেতে আছে। দুর্গটি রাজকীয় অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কোন সার্বভৌম শাসক দুর্গ দখল না করা পর্যন্ত শের খানের নিকট এর ভার ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। আপনি তাকে বিবাহ করুন। তাতে আপনি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবেন এবং কোন ব্যক্তি আপনাকে দুর্গও রাজ-বৈভব থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।' মালিকা বললেন,—দুর্গ সমর্পণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার ভাই মীর দাদকে শের খানের নিকট প্রেরণ করুন। কিন্তু একটা শর্ত আছে। শর্তটি হল, তিনি পিতৃহন্তা পুত্রকে নাক-কান কেটে এমন শাস্তি দেবেন যা অন্যের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

মীর দাদ শের খানের নিকট আগমন করলেন। শের খান যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সাথে মীর দাদকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি মীর দাদকে সকল ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করলেন। পরম বন্ধুত্ব ও সৌজন্য প্রদর্শন করে বললেন,—যদি মালিকা আমাকে দুর্গ প্রদান করেন এবং আমার সংগে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হন তাহলে চিরদিন আমি আপনার নিকট ঋণী হয়ে থাকব।' শের খান অতুলনীয় মধুময় ব্যবহার দ্বারা মীর দাদের হৃদয় দখল করে নিলেন। মীর দাদ বললেন,– 'রাজা ব্যতীত কাহারও হস্তে দুর্গ সমর্পণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু এখানে আগমনের পর আপনি আমার প্রতি যে দয়া ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেছেন তাতে আমার বিমুগ্ধ হৃদয় হতে আপনার হাতেই দুর্গ সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। এ কাজ বাস্তবায়িত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমি যা বলি মালিকা তার অন্যথা করবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ সমাধা হওয়ার পর আশা করি আমার সংগে কোনরূপ অসম্মানজনক ব্যবহার করবেন না।' শের খান শপথ করে বললেন—'এ দেহে প্রাণ থাকতে আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট সাধন হবে না। মীর দাদ অনতিবিলম্বে শের খানকে যাত্রা শুরু করার পরামর্শ

দিলেন। শের খান তদনুসারে অশ্বারোহণে রওনা হলেন। মীর খান অগ্রে শের খান অনুবর্তী। তিনি শের খানের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে মালিকাকে অনুরোধ জানালেন যেন তার হস্তে দুর্গের সমর্পণে কোনরূপ বিলম্ব না করা হয়। শীঘ্রই মীর দাদ মালিকা ও ভাইদের সম্মতি আদায় করে নিলেন। শের খানকে জলদি নিয়ে আসার জন্য মীর দাদকে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া হল। তাজ খানের পুত্রের অজ্ঞাতসারে যাতে দুর্গ সমর্পণের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায় তার ব্যবস্থাও নেয়া হল।

মীর দাদ শীঘ্রই শের খানের নিকট এসে বললেন যে, দুর্গ ও কোষাগার তার হাতে সমর্পণের জন্য সকলে রাযী। সুতরাং শের খানের উচিত মালিকা বেগমকে শাদী করা। দুর্গে প্রবেশের পর বিবাহ উৎসব পালনের জন্য তারা দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে মালিকার তরফ থেকে শের খানকে ১৫০টি মহামূল্য মুক্তা, সাত মণ মানিক্য, দেড়শ, মণ স্বর্ণ, নানাবিধ দ্রব্য ও অলঙ্কার উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করা হলো। পরে শের খান চুনার দুর্গের পাশ্ববর্তী পরগনাসমূহের প্রভুত্ব লাভ করেন। তা ছাড়া নাসির খানের বিধবা পত্নী গওহরের নিকট হতে ষাট মণ স্বর্ণ লাভ করলেন। তিনি দুর্গের প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ধন-মাল হস্তগত করে বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং নিজ শক্তিকে সুদৃঢ় ও সংহত করলেন। অতঃপর হাসান খান মেওয়াটি, রানা সিংহ এবং কয়েকজন আফগান মিলে সুলতান সিকান্দারের পুত্র সুলতান মাহমুদকে রাজা মনোনীত করলেন। এই সুলতান মাহমুদের সংগে সিক্রীর নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্বিতীয় জামসেদ বাবুরের এক যুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধে আদিল খান মেওয়াটির পুত্র হাসান খান এবং ডুনগার পুরের রাজা বাওয়ান নিহত হন। সুলতান মাহমুদ ও রানা সিংহ পরাজয় বরণ করে চিতোরে পলায়ন করে। সুলতান মাহমুদ চিতোরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছুদিন অবস্থানের পর পাটনায় ফিরে এলেন। সুলতান মাহমুদের শ্বশুর মসনদ-ই-আলা আজম খান, হায়বাত খানের পুত্র মসনদ-ই-আলা ঈসা খান, লাহোরের গভর্নর এবং মসনদ-ই-আলা উমর খান কলকাপুরিয়া, আহমদ খানের পুত্র ইবরাহীম খান, মুবারিজ খানের পুত্র ইউসুফ খাইল, সরহিন্দের গভর্নর এবং মিয়া বায়জিদ ফারমুলী সম্মিলিতভাবে মোগলদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। মিয়া বাবিন ও মিয়া বায়জিদ এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তারা মোগলদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করে শৌর্যবীর্যের জন্য

প্রচুর সুখ্যাতিও লাভ করেন। তারা সুলতান মাহমুদকে পাটনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে বসালেন রাজার আসনে। সুলতান মাহমুদ আমীর দু'জনকে সংগে নিয়ে বিহার আগমন করলেন। তাদের প্রতিরোধ করা শের খানের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তার সৈন্য সংখ্যা সীমিত, তদুপরি আফগানদের মধ্যে তাঁর এমন অসাধারণ প্রভাব নেই যদ্দারা তিনি এরূপ সকলকে একত্রিত করতে পারেন। সুতরাং তিনি সুলতান মাহমুদের সামনে হাযির হওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। আফগানরা বিহার রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল। তবে সুলতান শের খানকে বললেন—'যদি আমি জৌনপুরের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হই তাহলে বঙ্গাধিপতিকে পরাভূত করে আপনি যে বিহার রাজ্য দখল করেছিলেন তা আমি আপনাকে প্রদান করব। উদ্বিগ্ন হবেন না। যেহেতু সুলতান সিকান্দার বিহার রাজ্য দরিয়া খানকে প্রদান করেছিলেন সেহেতু আমি উক্ত রাজ্য আপনার হাতেই ন্যস্ত করব।' এ মর্মে ফরমান দেয়ার জন্য শের খান সুলতানকে অনুরোধ জানালেন। সুলতান সম্মত হয়ে ফরমান প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শের খান বিহার রাজ্যের ফরমান লাভ করলেন। তিনি ফরমাননামা গ্রহণপূর্বক জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। পূর্ণ সমর প্রস্তুতি গ্রহণের পর সুলতান মাহমুদ জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তার সংগে যথাশীঘ্র মিলিত হওয়ার জন্য শের খানের উপর আদেশ জারি করা হলো। এ নির্দেশ পাওয়ার পর শের খান লিখে জানালেন যে, সৈন্যবাহিনী সংগঠনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সংগে সংগেই তিনি সুলতানের সাথে এসে যোগ দেবেন। পত্রোত্তরের তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমীর-উমরাগণ সুলতানকে বললেন, শের খান মোগলের সংগে মৈত্রী স্থাপন করেছেন। সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ছলে তিনি কৌশল বিস্তার করে কালক্ষেপণ করছেন। সুতরাং তাকে বিশ্বাস করা কিংবা তার কথায় প্রত্যয় আনা সমীচীন নয়। সুলতানের সাথে সদলবলে যোগ দেবার জন্য তাকে বাধ্য করা উচিত। আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী বললেন,—'শের খানকে আমাদের সংগে আনা সহজ হয়ে পড়বে। আপনারা শান্ত হোন। এখন শের খানের জায়গীর অভিমুখে আমাদের যেতে হবে। বিলম্বের শাস্তিস্বরূপ তার নিকট হতে বিরাট অংকের ধন-সম্পদ আদায় করে তাকে আমাদের সংগে যোগদান করার জন্য বাধ্য করতে হবে।' সুলতান মাহমুদ ও পারিষদবর্গ আজম হুমায়ুনের এ

উপদেশে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। শের খান তখন শাশারামে অবস্থান করছিলেন। সুতরাং সুলতান মাহমুদ সদলবলে শাশারাম অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শের খান শুনতে পেলেন যে, তাকে জোরপূর্বক দলে ভিড়ানোর জন্য সুলতান মাহমুদ সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন। এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অমাত্যবর্গকে বললেন---'আমার উদ্ভাবিত কৌশল নিষ্ফল হয়েছে। সুলতানের অমাত্যদের মধ্যে আজম হুমায়ুন এবং ঈশা খান শিরওয়ানী নামক দু'ব্যক্তি অত্যন্ত চতুর, জ্ঞানী এবং শাসনকার্যে দক্ষ। তারা আফগান ও আত্মীয়বর্গের মর্যাদার খাতিরেই সুলতানের সৈন্য দলে যোগ দিয়েছেন। যদিও তারা জানেন যে, এ বাহিনীর দ্বারা কোনরূপ মঙ্গল সাধিত হবে না। এর কারণ হল, আমীরদের মধ্যে আত্মকলহ। আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি না। আমি অবশ্যই এ সৈন্যদলের সংগে গমন করব। কালবিলম্ব না করে অভিযাত্রার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ সৈন্যদলকে নির্দেশ দাও। আমি নিজেই সুলতানের সংগে মিলিত হতে যাচ্ছি। কৌতুকপ্রদ বাক্যে সন্তুষ্ট করার পর তার কাছে মাফ চেয়ে নেব এবং তাদেরকে সংগে নিয়ে আসব। কেননা মেহমানগণ আমারই আত্মীয়। তোমরা তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' শের খান তখন সুলতানকে স্বাগতম জানানোর জন্য বেরিয়ে গেলেন। বিভিন্ন উপায়ে সম্বর্ধনা জানানোর পর শেরশাহ পদমর্যাদা অনুসারে স্থানীয় আমীর ও দলপতির বাসভবনে মেহমানদের পাঠিয়ে দিলেন এবং থাকার ব্যবস্থা করলেন। সুলতানকে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ পারিতোষিক প্রদান করা হল। শেরশাহ এভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করলেন।

সৈন্যদলের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরও কিছুদিন অবস্থান করার জন্য তিনি সুলতানকে অনুরোধ জানালেন। সুলতান তার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। শের খান ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে সুলতানের সংগে যাত্রা শুরু করলেন। তারা জৌনপুরে পদার্পণ করার পর মোগলগণ স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। সুলতান কয়েকদিন তথায় অবস্থান করলেন। সেখান থেকে সৈন্যদলকে অভিযানে প্রেরণ করে লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য জেলা দখল করলেন। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর সম্রাট হুমায়ুন আগ্রা

হতে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অপরপক্ষে সুলতান মাহমুদও জৌনপুর থেকে লক্ষ্ণৌতে পৌঁছলেন। লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী অঞ্চলে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে এখানে প্রতিদিন খণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উভয় পক্ষের সৈন্য এসে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হত। শেরশাহ উপলব্ধি করলেন যে, আফগানদের মধ্যে কোন একতা নেই। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং তিনি হিন্দু বেগের নিকট লিখলেন—"মোগলগণ আমাকে ধূলা থেকে টেনে এনে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। সুলতান মাহমুদ আমাকে জোরপূর্বক সংগে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় আমি তাদের পক্ষে লড়ব না এবং সমরক্ষেত্র থেকে বিনাযুদ্ধে সরে দাঁড়াব। সম্রাট হুমায়ুনকে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলুন। যুদ্ধের সময় আমি তাঁর পক্ষ গ্রহণ করে সুলতান মাহমুদকে পরাভূত করার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করব। হিন্দু বেগে সম্রাটকে শের খানের পত্রখানা দেখালেন। সম্রাটের আদেশে শের খানের নিকট লিখে জানানো হল, 'সুলতানের বাহিনীর সংগে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন বলে মনে মনে অস্বস্তিবোধ করবেন না। যা বলেছেন সেভাবে কাজ করে যান। তাতে আপনারই সমৃদ্ধি হবে।' কয়েকদিন পর উভয় পক্ষ প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হলো। চরম সংকটময় মুহূর্তে শের খান বিনাযুদ্ধে সসৈন্যে পিছু হটে যান। ফলত সুলতান মাহমুদ পরাজয় বরণ করলেন। ইব্রাহীম খান এ সংগ্রামে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে প্রভূত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। তিনি দেহে প্রাণ থাকতে নিজের অবস্থান ত্যাগ করেন নি। তাকে বাধা প্রদানকারী প্রতিটি মোগলকে তিনি প্রতিহত করেন। অবশেষে নিজেই নিহত হন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মিয়া বায়জিদ বেসামাল ও অসতর্ক হয়ে পড়েন। সুতরাং তাকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ হারাতে হয়। সুলতান মাহমুদ ও অন্যান্য আমীর পরাজিত হয়ে বিহার রাজ্যে পালিয়ে যান। সৈন্যদল সংগঠনের জন্য সুলতানের নিকট রাজ্য কিংবা অর্থ বলতে আর কিছুই রইল না। যে সকল আমীর-উমরা তাকে সিংহাসন দখল করতে সাহায্য করেছেন তাদের অধিকাংশই লক্ষ্ণৌ যুদ্ধে হত হন। যারা অবশিষ্ট রইলেন তারাও আত্মকলহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সুলতান মাহমুদ বায়জিদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। মোগলদের প্রতিহত করার মত শক্তি তাঁর ছিল না। সুতরাং তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে পাটনায় বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি আর কখনও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হননি। সুলতান ৯৪৯ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজয় লাভের পর সম্রাট হুমায়ুন অধিকাংশ শত্রুকে সংহার করেন। শেরশাহের নিকট হতে চুনার দুর্গ কেড়ে নেয়ার জন্য তিনি হিন্দু বেগকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু শের শাহ দুর্গ সমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হুমায়ুন একথা শুনে সৈন্যবাহিনীকে চুনার দুর্গ অভিমুখে পরিচালিত করলেন। নিজ পুত্র জালাল খান (শের খানের মৃত্যুর পর ইনি ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন) এবং অপর এক জালাল খানকে (জুলু খানের পুত্র) চুনার দুর্গে রেখে শেরখান অনুচর ও পরিবারবর্গ নিয়ে নহরকুণ্ড পর্বতে চলে যান। হুমায়ুনের বাহিনী চুনার দুর্গ অবরোধ করলেন। প্রতিদিন যুদ্ধ চলতে থাকে। এ যুদ্ধে উভয় জালাল খান অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে গুপ্তচর পাঠিয়ে তথাকার প্রকৃত অবস্থা জেনে নেয়াই ছিল শের খানের রীতি। শের খান জানতে পারলেন যে, হুমায়ুন আর বেশী দিন এ অঞ্চলে অবস্থান করবেন না। কেননা, শের খানের গুপ্তচর খবর এনেছে যে, গুজরাট অধিপতি বাহাদুর শাহ মানদু রাজ্য দখল করেছেন। তিনি দিল্লী অবরোধের পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। হুমায়ুন এ সংবাদ অবগত হলেন। শের খান সম্রাটের নিকট এ মর্মে পত্র লিখে দূত পাঠালেন, 'আমি আপনার ভৃত্য এবং জুনায়েদ বিরলাসের আজ্ঞাবহ। অধিকন্তু লক্ষ্ণৌ যুদ্ধে আমি যে উপকার করেছি তা আপনি জানেন। আপনি কোন না কোন ব্যক্তির হাতে চুনার দুর্গের ভার অর্পণ করবেন। কাজেই দুর্গের দায়িত্ব আমার হাতেই ন্যস্ত করুন। পরবর্তী অভিযানে মোগল বাহিনীতে যোগদানের জন্য আমার পুত্র কুতুবখানকে আপনার নিকট প্রেরণ করব। রাজ্যের এ অংশ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমার পুত্র আপনার সংগে থাকবে। সুতরাং আমি কিংবা অপর কোন আপনজন আপনার প্রতি অবাধ্যতামূলক আচরণ করলে আপনি তাকে (পুত্রকে) এমন শাস্তি দিবেন যা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

শের খানের প্রতিনিধি এ পত্র হুমায়ূনের নিকট পেশ করার পর সম্রাট উত্তর দিলেন—'আমি চুনার দুর্গ শের খানকে দিতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। তা হলো, জালাল খানকেই আমার সংগে পাঠাতে হবে।' শের খান উত্তর পাঠালেন—পিতা-মাতার নিকট সকল সন্তানই সমান আদরের। জালাল খান কোন অংশে কুতুব খানের চাইতে যোগ্য নয়। কিন্তু আমার বহু

শত্রু রয়েছে। এ সকল শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য আপনাকে আমার সংগে রাখা দরকার, ঠিক এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, মীরজা মুহাম্মদ জামান নামক যে ব্যক্তিকে বায়ানা দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তিনি জাল ফরমান দেখিয়ে মুক্ত হয়ে নানা গোলমাল শুরু করেছেন। গুজরাটের বাহাদুর শাহও দিল্লী অভিযান শুরু করতে মনস্থ করেছেন। সুতরাং হুমায়ুন শের খানের প্রতিনিধিকে বললেন যে, শেরশাহ রাজভক্ত লোক। সুতরাং তিনি যদি প্রস্তাবে রাযী হয়ে কুতুব খানকে সম্রাটের সংগে পাঠান তবে শের খানকে চুনার দুর্গ দেয়া হবে। শের খান অত্যন্ত আনন্দিত মনে পুত্র কুতুব খান ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্তা ঈসা খানকে সম্রাটের কাছে পাঠালেন। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীতে গিয়ে সুলতান বাহাদুরের বিদ্রোহ দমনে আত্মনিয়োগ করলেন। শের খান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। সমগ্র বিহার রাজ্যের প্রতিটি শত্রুকে তিনি দমন করলেন। তিনি সকল আফগানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করলেন। আফগানদের অনেকেই দুর্ভাগ্যবশত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করে শের খান তাদের দুর্দশা মোচন করলেন। যারা ভিক্ষার জীবিকা ত্যাগ করতে অস্বীকার করল, শের খান তাদের হত্যা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যে সকল আফগান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করবে না তাদের হত্যা করা হবে। এ কাজে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তিনি দৃষ্টি রাখলেন যাতে অহেতুক আফগানদের জীবন বিনষ্ট না হয়। আফগানরা যখন শুনতে পেল যে, শের খান তাদের গোত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। তখন তারা চতুর্দিক হতে দলে দলে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল।

সুলতান বাহাদুর পরাজিত হয়ে সুরাত অভিমুখে প্রস্থান করলেন। তাঁর অধীনস্থ ছোট-বড় সকল শ্রেণীর আফগান শের খানের বাহিনীতে এসে যোগ দিল। শের খানের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তারা সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে তাঁর অধীনে স্বেচ্ছায় কাজ করতে লাগল। তদনুসারে, আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী, মসনদ-ই-আলা হায়বত খান সুকাইলের পুত্র মসনদ-ই-আলা ঈসা খান, মিয়া বাবিন শাহখাইল, কুতুব খান খাইল, মারুফ ফারমুলী, সুলতান আলম খান সুহখাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজম হুমায়ুন। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চপদস্থ আফগান শের খানের অধীনে যোগদান করলেন। তিনি হযরত আলী উপাধি ধারণ করলেন।

বেগম ফতেহ মালিকা ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য রমণী। তিনি ছিলেন সুলতান বহলুলের ভগ্নী পাহাড় ফারমুলীর কন্যা। মিয়া মুহাম্মদ পরিনামদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্য সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সম্পদ সঞ্চয়ের দিকেই তিনি প্রধানত মনোনিবেশ করেছিলেন। মিয়া মুহাম্মদ সুলতান বহলুলের নিকট হতে সমগ্র অযোধ্যার এবং আরও কতিপয় পরগনার জায়গীর লাভ করেছিলেন। পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবেও তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। সুলতান বহলুল, সিকান্দার এবং ইব্রাহীমের রাজত্বকালে মিয়া মুহাম্মদকে কোনরূপ বিবাদের সম্মুখীন হতে হয়নি। এই শান্ত পরিবেশে তিনি ধনসম্পদ সঞ্চয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। আমি (গ্রন্থকার) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি যে, মিয়া মুহাম্মদ তিনশ' মণ খাঁটি সোনা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ছাড়া অন্য জিনিস ক্রয় করতেন না। মিয়া মুহাম্মদ ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি মুস্তফা নামক দত্তক পুত্রের সংগে ফতেহ মালিকার বিবাহ দেন।

সুলতান ইব্রাহীমের রাজত্বের শেষের দিকে মিয়া মুহাম্মদের মৃত্যু হয়। তিনি পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন মিয়া নিয়ামু নামক বালককে রেখে যান। বালকটির মাতা-পিতার সুনির্দিষ্ট পরিচয় না জানার কারণ হল ঃ মিয়া কালা পাহাড় তার এক উপপত্নীকে ভৃত্যের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। কিছুদিন ভৃত্যের গৃহে অবস্থানের পর উক্ত মহিলার গর্ভে এক সন্তান জন্মলাভ করে। জননী সন্তানকে কালা পাহাড়ের পুত্র বলে ঘোষণা করে। এই সংবাদ পেয়ে মিয়া মুহাম্মদ মহিলাটিকে ভৃত্যের নিকট হতে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন এবং নবজাতককে নিজ পুত্র বলে স্বীকার করেন। ছেলেটি বেশ শক্ত-সামর্থ পুরুষ হিসেবে গড়ে উঠল। সুলতান ইব্রাহীম শেখ মুস্তফার সংগে ফতেহ মালিকার বিবাহ দেন। মুস্তফা ছিলেন মালিকার চাচাতো ভাই এবং নিজাম মুহাম্মদ কালা পাহাড়ের উত্তরাধিকারী। কিন্তু কালা পাহাড়ের সম্পত্তির মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশ এবং অযোধ্যার একটি কিংবা দুটি পরগনা মিয়া নিয়ামুকে দেয়া হল। অধিকাংশের অধিকারী হলেন ফতেহ মালিকা।

এই মুস্তফাই সুলতান ইব্রাহীমের রাজত্বকালে ও তৎপরবর্তী সময় যুদ্ধে বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হন। আমি (গ্রন্থকার) বিভিন্ন ইতিহাস বেত্তার নিকট শুনেছি যে, সুলতান ইব্রাহীমের জীবদ্দশায় কয়েকটি ভূখণ্ড নিয়ে মিয়া মুস্তফা এবং মিয়া মারুফ ফারমুলী পরস্পর কলহে লিপ্ত

হন। এ বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হয়। যুদ্ধের প্রাক্কালে বহু মণ মিষ্টান্ন তৈরী করে পিতা মিয়া মুহাম্মদের স্মরণে ভিখারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই ছিল মিয়া মুস্তফার রীতি। এ পর্ব শেষ করে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করতেন।

মিয়া মুস্তফা মৃত্যুকালে মিহির সুলতান নামক এক যুবতী কন্যা রেখে যান। ফতেহ মালিকা ছিলো গুণবতী মহিলা। তিনি মুস্তফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিয়া বায়জিদকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তিনি একদিন বায়জিদকে ডেকে বললেন---তুমি যদি সৈন্যদল গঠনে ব্রতী হও তবে আমি অর্থ সরবরাহ করব। মিয়া বায়জিদ টাকা নিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন।

তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মিয়া বায়জিদ ও মিয়া বাবিনের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু বায়জিদের মৃত্যুর কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু তার কাহিনীর পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। বায়জিদ নিহত হওয়ার প্রাক্কালে মালিকা অবস্থান করছিলেন বিহারে। ধনসম্পদ রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে পাটনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বিহারের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন। পাটনার রাজা ধনশালী আফগানদের প্রতি অতিশয় আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন। কিন্তু বায়জিদের মৃত্যু এবং সুলতান মাহমুদের রাজ্যোদ্ধার প্রচেষ্টা ত্যাগের পর রাজা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, আফগানের ভাগ্যে ভাটা পড়ে গেছে। সুতরাং তিনি আশ্রিত আফগানদের উপর শুরু করলেন অত্যাচার। মালিকা এ সংবাদ পেয়ে পাটনা গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এ সংবাদ পেয়ে শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কৌশলে মালিকাকে হস্তগত করার অভিলাষী হন। কারণ মালিকা বেগম যদি অন্য রাজ্যের আনুগত্য স্বীকার করেন তাহলে সমগ্র ধনসম্পত্তি শের খানের হস্তচ্যুত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন। এরূপ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলে শের খানের পক্ষে তা চরম আফসোসের ব্যাপার বৈ কি! সুতরাং তিনি মালিকার নিকট এইমর্মে পত্র লিখে দূত পাঠালেন, 'সুলতান বহলুল এবং সিকান্দারের আমীর-ওমরাহ এবং আত্মীয়বর্গ আমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আফগানের মর্যাদা রক্ষাকল্পে তারা সমবেত হয়েছেন। এ অধীন ভৃত্যও একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আফগান গোত্রের উপর দুটি কারণে আপনারও দাবি রয়েছে। প্রথমত আপনি সুলতান মুহম্মদের পরিবার

উত্তুর্ত। দ্বিতীয়ত সুলতান বহলুলের অধঃস্তন পুরুষদের সংগে আপনার রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে। এ ভৃত্য কি অপরাধ করেছে যে, আপনি তার রাজ্যে পদার্পণে বিলম্ব করছেন। ওখানকার অবিশ্বাসীদের উপর আস্থাশীল হওয়া যায় না। আল্লাহ্ না করুন, আপনি যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে যদি আপনার উপরে কোনরূপ হামলা হয় তবে তা হবে আমার পক্ষে চিরস্থায়ী কলঙ্কস্বরূপ। লোকে বলবে শেরশাহকে বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই মালিকা তার রাজ্যে যান নি।' দূত মালিকার নিকট উক্ত পত্র হস্তান্তর করলেন। তিনি শের খানের পত্রের জবাব দিলেন, শের খান যদি একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেন এবং তা রক্ষা করার শপথ নেন তাহলে মালিকা তার রাজ্যে আগমন করবেন। শের খান এ প্রস্তাবে রাযী হলেন। মালিকা তার নিকট এক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। উক্ত ব্যক্তির সামনেই শের খান মালিকার নিরাপত্তা বিধানের পবিত্র শপথ গ্রহণ করলেন। মালিকা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়ার পর শের খানের নিকট আগমন করে তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন।

বাংলার অধিপতি নজিব শাহের মৃত্যুর পর আমীরগণ সুলতান মাহমুদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ফলে রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। শের খান এ সুযোগে বাংলা দখল করতে মনস্থির করলেন। সেনাবাহিনীর অস্ত্র সজ্জার জন্য তিনি মালিকার নিকট হতে তিনশ মণ স্বর্ণ গ্রহণ করেন। বিনিময়ে তাকে দু'টি পরগনা দেয়া হল। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য শের খান মালিকাকে কিছু নগদ টাকাও প্রদান করলেন। জালাল খান এ সময় মালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কন্যা মেহের সুলতানাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শের খান জালাল খানকে নিষেধ করলেন। মালিকা তাঁর কন্যাকে সুলতান সিকান্দার নামক এক আত্মীয়ের নিকট বিবাহ দেন। সিকান্দার ছিলেন অযোগ্য ব্যক্তি। মেহের সুলতানার জীবদ্দশায় তার স্বামী আরাম আয়েশে দিন যাপন করতেন। ৯৭৫ হিজরীতে আকবরের রাজত্বকালে মেহের সুলতানা কায়াত যাওয়ার পথে মোজাফফর খানের গৃহে মৃত্যুবরণ করেন। শেরশাহ মেহেরের টাকায় সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এদেশের শিকরী গালি নামক স্থানের সবকিছু তার হস্তগত হয়।

সম্রাট হুমায়ূন গুজরাট হতে প্রত্যাবর্তনের পর খান খানান ইউসুফ খাইল (যিনি বাবরকে কাবুল থেকে ভারতে এনেছিলেন) তাকে বললেন—‘শের খানকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি এখন বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছেন। শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কুশলতা তার নখদর্পণে। অধিকন্তু সমস্ত আফগান তার অধীনে সমবেত হয়েছে।’ এতসব বলা সত্ত্বেও নিজের বিশাল বাহিনী ও সাম্রাজ্যের গর্বে স্ফীত থাকায় হুমায়ুন শের খানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বর্ষাকাল আগ্রায় অতিবাহিত করে তিনি হিন্দু বেগকে জৌনপুরে প্রেরণ করলেন। শের খানের গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্ণ খবরাখবর প্রেরণের জন্য সম্রাট তাকে নির্দেশ দিলেন। [সম্রাটের বিহার অভিযানের ইচ্ছার কথা অবগত হওয়ার পর শের শাহ জৌনপুরের গভর্নরকে মহামূল্য পারিতোষিক দিয়ে তার শুভেচ্ছা আকর্ষণ করলেন। শের খান হিন্দু বেগকে লিখলেন—‘আমি প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হইনি এবং সম্রাটের রাজ্য আক্রমণ করিনি। অনুগ্রহপূর্বক সম্রাটের নিকট পত্র লিখে আমার রাজ-ভক্তির কথা তাকে জানিয়ে দিন এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা থেকে তাকে বিরত করুন। কেননা আমি সম্রাটের একজন ভৃত্য ও তার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী।’ হিন্দু বেগ শের খানের পারিতোষিক গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত খুশী হয়ে দূত মারফত বলে পাঠালেন—‘যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কেউ আপনার ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না। শের খানের দূতের সম্মুখেই তিনি সম্রাটের নিকট লিখলেন—‘শেরশাহ জাঁহাপনার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য। তার রাজ্যে আপনার নামেই মুদ্রা প্রচলিত, খুতবায়ও পাঠ করা হয় আপনার নামই এবং তিনি আপনার রাজ্যের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি, এক কথায় শের খান এমন কোন কাজ করেন নি যা সম্রাটের চিত্তকে উদ্বিগ্ন করতে পারে।’ হিন্দু বেগের পত্র পেয়ে সম্রাট ঐ বছর অভিযান স্থগিত রাখলেন। ইত্যবসরে শের খান বাঙলা ও গৌড়নগর দখল করার জন্য জালাল খান, কাওয়াস খান এবং অন্যান্য দলীয় প্রধানকে তথায় প্রেরণ করলেন। সুলতান মাহমুদ এসব অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে গৌড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আফগান বাহিনী চতুর্দিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর দুর্গ অবরোধ করলেন। এ পর্যায়ে দুর্গের সম্মুখে প্রতিদিন খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে।

পর বছর সম্রাট বাঙলা ও বিহার অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলেন। চুনার দুর্গের নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি আমীরদের সংগে পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। প্রথমে চুনার দুর্গ অবরোধ করবেন কিংবা শের খানের পুত্র কর্তৃক অবরুদ্ধ গৌড় অভিমুখে যাত্রা করবেন—তা নিয়ে পরামর্শ করা হল। মুগল আমীরদের সকলেই প্রথমে চুনার দুর্গ দখল করে অতঃপর গৌড় অভিমুখে যাত্রার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কিন্তু খান খানান ইউসুফ খানের অভিমত চাওয়া হলে (পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুগল আমীরগণ প্রথমে চুনার দুর্গ দখলের পরামর্শ দিয়েছেন) তিনি বললেন,—'যুবকদের উপদেশ হল প্রথমে চুনার দুর্গ দখল করা কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠদের উপদেশ অনুযায়ী সর্বপ্রথম গৌড় দখল করে তথাকার কোষাগারে সঞ্চিত অগাধ ধনসম্পদ হস্তগত করা উচিত। তারপর চুনার দুর্গ দখল করা একটি সহজসাধ্য ব্যাপার।' সম্রাট জবাব দিলেন,—'আমি নিজে যুবক সুতরাং যুবকদের উপদেশ সমর্থন করলাম। চুনার দুর্গকে আমি পশ্চাতে ফেলে যাব না।' গ্রন্থকার খান খানানের সংগীদের নিকট শুনেছেন, তিনি যে খান খানান বাসভবনে ফিরে আসার পর মন্তব্য করেছিলেন, 'শের খান অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ মুগলগণ গৌড়ে অভিযান পরিচালনা করেনি। মোগলগণ গৌড় অধিকারের পূর্বেই আফগানেরা তা দখল করে নেবে। ফলত গৌড়ের সমগ্র ধনসম্পদ তাদেরই হস্তগত হবে।'

শেরশাহ চুনারের অধিনায়ক গাযী শূর এবং বুলাকীকে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের বহরকুণ্ড দুর্গে স্থানান্তর করলেন। কিন্তু তাঁর সংগে বহু পরিবার থাকায় বহরকুণ্ডে তাদের স্থান সংকুলান হল না। রোহতাস দুর্গের অধ্যক্ষ ও শের খানের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। দুর্গের অধ্যক্ষ চুরামন ছিলেন একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। তিনি পূর্বে শেরশাহের সহোদর ভ্রাতা নাজিমের পরিবারকে উক্ত দুর্গে আশ্রয় দিয়ে দয়া প্রদর্শন করেছিলেন। বিপদমুক্ত হওয়ার পর নাজিম দুর্গ ত্যাগ করে চলে যান। শের খান পূর্বের উপকারের কথা উল্লেখ করে এবং বর্তমান সংকটের কথা জানিয়ে রোহতাস দুর্গের রাজার নিকট লিখলেন যে, রাজা যদি কিছু দিনের জন্য তাকে দুর্গ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি চিরঋণী থাকবেন এবং বিপদমুক্ত হওয়ার পর পুনরায় রাজাকে দুর্গ ফিরিয়ে দেবেন। চুরামন উত্তরে লিখলেন—'আনন্দ প্রকাশ কর। রাজা যাতে তোমাকে সাময়িক-ভাবে দুর্গ ছেড়ে দেন আমি তার ব্যবস্থা করব।' চুরামন দুর্গের রাজার

নিকট গিয়ে বললেন---'শেরশাহ রোহতাস দুর্গে থাকতে চেয়েছেন। তিনি আপনার প্রতিবেশী। তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ। তার পরিবারকে দুর্গে অবস্থানের অনুমতি দেয়া উচিত, আমিও এব্যাপারে একমত। রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হন। শের খান পরিবারকে বহরকুণ্ড থেকে রোহতাস দুর্গে পাঠিয়ে দেয়ার পর রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বললেন,---'নাজিমকে আমি যখন আশ্রয় দিয়েছিলাম তখন তার অধীনে ছিল একটি ক্ষুদ্র বাহিনী। আমি ছিলাম তার চেয়ে অধিকতর শক্তিমান। বর্তমানে শের খানের হাতে রয়েছে একটি শক্তিশালী বাহিনী অপর পক্ষে আমার বাহিনী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। একবার যদি তারা দুর্গে প্রবেশ করার অনুমতি পায় এবং পরে ফিরিয়ে না দেয় তবে বলপ্রয়োগ করে তা কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' চুরামন শের খানের নিকট লিখলেন---'আমার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে কুপরামর্শ দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তাকে প্ররোচিত করেছে। রাজা আপনাকে দুর্গ দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।' এ সংবাদ পেয়ে শের খান অত্যন্ত দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি রাজার নিকট লিখে জানালেন---'আপনার অঙ্গীকারে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি বহরকুণ্ড থেকে পরিবারবর্গকে সরিয়ে এনেছি। সম্রাট হুমায়ুনের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সৈন্য পাঠিয়ে আফগান পরিবারকে বন্দী করে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করবেন। এ দুর্দশার দায়ভাগী হবেন আপনিই।' শের খান চুরামনকে ছয় মণ স্বর্ণ উৎকোচ দিয়ে বললেন,---'যেভাবেই হোক আপনি রাজাকে রাযী করিয়ে কিছুদিনের জন্য দুর্গের মধ্যে আমার পরিবার অবস্থানের ব্যবস্থা করুন। তিনি যদি সম্মত না হন তাহলে আমি হুমায়ুনের নিকট গিয়ে মৈত্রী স্থাপন করব। তারপর রাজার সবকিছু কেড়ে নিয়ে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব।' চুরামন বললেন,---'উদ্বিগ্ন হবেন না আমি আপনার পরিবার ও সন্তানের আশ্রয়ের অনুমতি আদায় করে নেব।' চুরামন রাজার নিকট গিয়ে বললেন,---'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ আপনার মর্যাদা হানিকর। আপনার কথার উপর ভরসা করেই শেরশাহ পরিবার-পরিজনকে বহরকুণ্ড দুর্গ থেকে নিয়ে এসেছেন। পরিবারের এ অরক্ষিত অবস্থার কথা জানতে পারলে সম্রাট তাঁকে আক্রমণ করে সপরিবারে ধ্বংস করবেন। এর সমস্ত অপরাধ আমার ঘাড়েই বর্তাবে। অধিকন্তু শের খানের অবস্থা চরমে পৌঁছলে তিনি সম্রাটের সংগে মৈত্রী স্থাপন করবেন। তারপর আপনি শের খানের দ্বারা আক্রান্ত হবেন। তাকে প্রতিহত করার শক্তি আপনার নেই। কেন

আপনি তার সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে অহেতুক আপনার রাজ্যকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করছেন? আমি ব্রাহ্মণ। শের খান আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে এ রাজ্যে আগমন করেছেন। তার পরিবার নিহত হলে সমস্ত অপরাধ আমার উপর আপতিত হবে। আপনি যদি তাকে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি না দেন তাহলে আমি আপনার সম্মুখেই বিষপানে আত্মহত্যা করব।' চুরামনের এই অটল সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে রাজা শের খানকে দুর্গ প্রদানে সম্মত হলেন। এ সম্মতির কথা শের খানের কর্ণগোচর হওয়ার পূর্বেই তিনি গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন, কাওয়াস খান গৌড় দুর্গের পরিখায় ডুবে মরেছেন এবং চুনার দুর্গ সম্রাট হুমায়ুনের হস্তে সমর্পিত হয়েছে। এ সংবাদে শের খান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। কাওয়াস খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খানকে তিনি একটি সৈন্যদলের দায়িত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করলেন, যেহেতু চুনার দুর্গের পতন হয়েছে সেহেতু বিজয়ী সম্রাট কয়েক দিনের মধ্যে বঙ্গ অভিযানে যাত্রা করবেন। এই সুযোগে বিপুল পরাক্রমে গৌড় আক্রমণের জন্য শেরশাহ কাওয়াস খানকে নির্দেশ দিলেন।

কাওয়াস খান গৌড়ে পৌঁছে জালাল খানকে বললেন—'কালবিলম্ব না করে গৌড় পদানত করার জন্য শেরশাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। কেননা সম্রাট আমাদের পশ্চাতে আগমন করছেন।' জালাল খান বললেন—'আজ সবুর কর।' কিন্তু কাওয়াস খান উত্তর দিলেন—'আমি আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না, আমাদের এখনই আক্রমণ করা উচিত।' জালাল খান বললেন—'তাই যদি হয় তাহলে নিজস্থানে গমন কর।' কাওয়াস খান জালাল খানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সৈন্যদলকে উৎসাহিত করে বললেন,—'কোনরূপ বিলম্ব না করে প্রাণপণ চেষ্টায় দুর্গ আক্রমণ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।' সৈনিকদের মাঝে যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ প্রচারের জন্য ঘোষকদের নির্দেশ দেয়া হল। এরূপ অবস্থায় সময় অপচয় করা যায় না। তিনি নিজে সমরসাজে সজ্জিত হয়ে জালাল খানের নিকট সংবাদ পাঠালেন,—'শের খানের আদেশ পালনের জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি। এখন শুধু আপনার অপেক্ষায় রয়েছি। আপনিও সৈন্যদলকে সজ্জিত করুন। কাল বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। ইনশা আল্লাহ্ আমরা বিজয়ী হব।' জালাল খান, সুজাত খান ও অন্যরা অসন্তুষ্ট হলেন।

যাহোক শেষাবধি তারা সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কাওয়াস খান ব্যক্তিগতভাবে এরূপ শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিলেন যে, জালাল খানের আগমনের পূর্বেই তিনি দুর্গ জয় করতে সমর্থ হন। ঐ দিন থেকে তার সৌভাগ্যের সূচনা হলো। তারপর তিনি যেখানেই গমন করছেন সেখানেই বিজয়ের গৌরব তাঁর পদচুম্বন করেছে। কোমল ও কঠোরতার সমন্বয়ে শের খানের সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।

গৌড় পদানত হওয়ার পর জালাল খান পিতার নিকট বিজয় সংবাদ প্রেরণ করেন এবং সমগ্র গৌরব কাওয়াস খানের উপর আরোপ করেন। এ সংবাদে শের খান অতিশয় সন্তুষ্ট হন। চুরামন তাঁর নিকট এসে বললেন যে, রাজা তাকে পরিবার-পরিজন আনয়নের জন্য রোহতাস দুর্গ দিতে সম্মত হয়েছেন। শের খান স্ত্রী পরিজনকে দুর্গের সন্নিকটে নিয়ে আসলেন। তিনি এ বন্ধুত্বের জন্য রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাকে প্রচুর টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে বললেন,—'আমি যদি কোনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তাহলে আপনার প্রতি আমার কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হব না।' রাজা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বললেন,---'রোহতাস দুর্গ আপনারই। আপনার পরিবারকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আদেশ দিন।' শের খান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যারা দুর্গে প্রবেশ করছে তারা যেন বহির্গত না হন। শের খান অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্গ পরীক্ষা করলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে বললেন,—'চুনার দুর্গও এর তুল্য হতে পারে না। চুনার দুর্গ আমার হস্তচ্যুত হয়েছে। কিন্তু রোহতাস আমার অধীনে এসেছে। আমি গৌড় বিজয়েও এত আনন্দলাভ করিনি।' শের খান রাজা কর্তৃক নিয়োজিত দুর্গের প্রহরীদের বললেন,—'রাজার নিকট বল যে, তোমরা আফগানদের সংগে একই স্থানে অবস্থান করতে পারবে না। কারণ এটা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তিনি আপন লোকদের আদেশ দিলেন, যদি প্রহরিগণ দুর্গ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তবে তাদের জোরপূর্বক অপসারণ করতে। শের খানের লোকজন এ কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা প্রহরিদের নিকট শের খানের আদেশের কথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ দুর্গ ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় শের খানের অনুচরগণ তাদের জোর করে বিতাড়িত করলেন। সুতরাং শের শাহ দুর্গের প্রতিটি স্থানে নিজের প্রহরী নিয়োগ করে নিরাপত্তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। তিনি রাজাকেও দুর্গ থেকে বিতাড়িত করলেন। এভাবেই তিনি দুর্গের অধিকারী হন।

সাধারণভাবে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, শের খান আফগানদের দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাদেরকে মেয়েদের মত দুর্গের অভ্যন্তরে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। কেননা আমি (গ্রন্থের লেখক) শের খানের কয়েকজন আমীর-ওমরাহর নিকট এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখেছি। আমাত্য-প্রধান মোজাফ্ফর খান, মসনদ-ই-আলা ঈসা খান ও শেখ মুহাম্মদের ভাগ্নে, মিয়া বায়জীদ মারওয়ানী এবং আরও কতিপয় আমীরের নিকট এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করায় তাঁরা উত্তর দিলেন—'সুলতান বহলুল, সুলতান সিকান্দার, শেরশাহ এবং সেলিম শাহের সংগে তোমার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং পূর্বপুরুষের সঠিক ইতিহাস তোমার জেনে নেয়া উচিত। আমাদের কথা শুনে নাও। কেননা সময়ের বিবর্তনে প্রকৃত ঘটনার মধ্যে নানাবিধ ত্রুটি ও প্রমাদ অনুপ্রবেশ করে। আমরা নিজে যা শুনেছি এবং দেখেছি তাই-ই তোমার নিকট বর্ণনা করব।' হায়বত খানের দৌহিত্র এবং জালাল খানের পুত্র মোজাফ্ফর খানকে আমি বললাম,—'সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, আচ্ছাদিত শিবিকার সাহায্যে আফগানদের দুর্গে অনুপ্রবেশ করিয়ে শের খান রোহতাস দুর্গ দখল করেছেন। কিন্তু আপনারা তা অস্বীকার করছেন। এখন কার কথা বিশ্বাস করব তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।' তিনি উত্তর দিলেন —'তুমি জান আমি মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের অনুসারীদের সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন শের খানের সংগে পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম তখন আমার পরিবারবর্গ রোহতাস দুর্গেই বাস করত। রোহতাস দুর্গ হস্তগত করার পর শের খান জ্যেষ্ঠপুত্র আদিলখানে এবং কুতুব খানের পরিবার-পরিজনকে উক্ত দুর্গে রেখে নিজে বহরকুণ্ড পর্বতে চলে যান এবং স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরতে থাকেন।'

চুনার দুর্গ পদানত করার পর সম্রাট হুমায়ুন বেনারসে যাত্রা স্থগিত রেখে বিহার রাজ্য দখলের অভিপ্রায়ে শের খানের নিকট দূত প্রেরণ করেন। শের খান এ অভিসন্ধির কথা পূর্বে জানতেন। তিনি হুমায়ুনের দূতকে বললেন, 'গৌড় দুর্গ আমার পদানত। ইতিমধ্যেই আমি বিপুল সংখ্যক আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেছি। সম্রাট যদি বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন তাহলে বিহার রাজ্য তার নিকট সমর্পণ করব, কিংবা তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট তা হস্তান্তর করব। তাছাড়া সুলতান সিকান্দারের সময় বাংলার যে সীমা ছিল আমি তাও মেনে নেব। রাজভক্তির

স্মারক হিসেবে আমি সম্রাটের নিকট ছত্র-সিংহাসন প্রভৃতি প্রেরণ করব। বাংলা হতে বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা পাঠাতেও আমি স্বীকৃত। কিন্তু সম্রাটকে আগ্রায় ফিরে যেতে হবে।' দূত ফিরে এসে সম্রাটের নিকট শের খানের অভিমত ব্যক্ত করলেন। সম্রাট বিহার খানের কথা শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে শের খানের সকল প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শের খানের জন্য তিনি একটি অশ্ব ও অপূর্ব জমকালো খেলাত প্রেরণ করেন। সম্রাট বলে পাঠালেন যে, শের খানের সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিলম্ব করা উচিত নয়। দূত শের খানের নিকট এসে সম্রাট প্রদত্ত অশ্ব ও পোশাক প্রদান করে সম্রাটের বক্তব্য পেশ করলেন। শের খান অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন,—'আমি সমগ্র চুক্তি পূরণ করব এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দিনরাত প্রার্থনা করব যেন সারা জীবন আমাদের মধ্যে কোনরূপ তিক্ততা বা শত্রুতার সৃষ্টি না হয়। কেননা তিনি আমার পালক আমি তাঁর ভৃত্য।'

এঘটনার তিনদিন পর সম্রাটের দরবারে বাংলার অধিপতি সুলতান মাহমুদের দূত এসে নিম্নোক্ত পয়গাম পেশ করলেন,--- 'আফগানেরা গৌড় দুর্গ পদানত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূ-খণ্ড এখনো আমার দখলে রয়েছে। জাঁহাপনা আপনি শের খানের প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করবেন না। তারা নিজেদের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই আপনি বাংলায় আগমন করে তাদের বিতাড়িত করুন এবং সমস্ত বিদ্রোহ দমন করুন। আমিও আপনার সংগে যোগদান করব। আপনাকে প্রতিহত করার মত শক্তি তাদের নেই।' সুলতান মাহমুদের এ অনুরোধ পত্র পাওয়ার পর সম্রাট তার বাহিনীকে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর খান খানান ইউসুফ খাইল এবং আরও কতিপয় আমীরকে বহরকুণ্ড পর্বতের দিকে সর্বাগ্রে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিলেন। শেরখান তখন উক্ত পর্বতেই অবস্থান করছিলেন। সদলবলে গঙ্গা অতিক্রমপূর্বক হাজীপুরে রওয়ানা হওয়ার জন্য মীরজা হিন্দলকে নির্দেশ দেয়া হল। সম্রাট নিজেও বাংলা অভিমুখে অভিযান শুরু করলেন।

শের খান গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাটের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ও চুক্তির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তিনি দূতকে বললেন,---'আমি সর্বদা সম্রাটের অনুগত রয়েছি। তার কাছে কোন অপরাধ করিনি কিংবা তার রাজ্য সীমানায় কোনরূপ হস্তক্ষেপও করিনি। লোহানিদের নিকট হতে

যখন আমি বিহার দখল করি তখন বঙ্গাধিপতি বিহার আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করেন। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে তাকে একাজ থেকে বিরত রেখেছি। কেননা বিহার হস্তচ্যুত করার ইচ্ছা আমার ছিল না কিন্তু শক্তির দর্পে আমার কথায় কর্ণপাত না করে তিনি অত্যাচার শুরু করেন। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় আমি জয়লাভ করেছি। যেহেতু তিনি বিহারের উপর লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেহেতু আল্লাহ্ তার নিকট হতে বাঙলাও ছিনিয়ে নেন। সম্রাট শুধু বাঙলার রাজার কথাই বিবেচনা করেছেন। কিন্তু অতীতে আমি এবং আমার আফগান বাহিনী তাঁর যে উপকার সাধন করেছি তিনি তা বেমালুম ভুলে গিয়ে বাঙলার দিকে অভিযান শুরু করেছেন। সম্রাট চুনার দুর্গ অবরোধ করলে তাকে বাধা দেয়ার জন্য আফগানবাসী আমাকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু আমি যুদ্ধ ঘোষণা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের বলেছিলাম,— 'সম্রাট অত্যন্ত শক্তিশালী। একটা দুর্গের জন্য তার সংগে যুদ্ধ করা উচিত হবে না। কেননা তিনি আমার প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক। যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন যে, শক্তিশালী সৈন্যদল হাতে থাকা সত্ত্বেও আমি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি। তখন তিনি আমার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে একটি রাজ্য প্রদান করবেন। সম্রাট বিহার রাজ্য হস্তগত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি উহা তার হাতে সমর্পণ করেছি—কিন্তু শত্রুকে সন্তুষ্ট করার জন্য আফগানদের আর এভাবে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। সম্রাট আমার এ সকল সুকর্মের কোন মর্যাদাই দিলেন না। তদুপরি তিনি সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং তাকে বাধা দেয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ আফগানদের সম্মুখে খোলা নেই। আফগানরা কি করবে অচিরেই মোগলরা জানতে পারবে। সম্রাটের বাঙলা অভিযান অনুশোচনা ও অনুতাপের মধ্যেই সমাপ্ত হবে। আফগানরা এখন একতাবদ্ধ। তারা সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিহার করেছে। এ পর্যন্ত মোগলরা আফগানের কাছ থেকে যে সকল রাজ্য দখল করেছে তা কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলেই সম্ভব হয়েছে।' এই বলে শেরশাহ পারিতোষিক দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। তিনি সৈন্যদলকে রোহতাস দুর্গে প্রেরণ করলেন। শেরশাহ নিজে সামান্য সংখ্যক অশ্বারোহী নিয়ে গোপনে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখান থেকে তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য জানার জন্য তিনি তাঁর শিবিরে গুপ্তচর পাঠালেন। হুমায়ুন

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর শের খানের পর্বতে যাত্রার কথা জানতে পারলেন। সুতরাং তিনি ফিরে আসলেন। শের খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত ইউসুফ খাইল শেখ ইয়াহিয়ার পরগনায় যাত্রা স্থগিত রাখলেন। এখান থেকে তারা গৌড়ের অধীশ্বর সুলতান মাহমুদ বারির আগমন সংবাদপ্রাপ্ত হলেন। ইউসুফ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হলেন। সুলতানকে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সম্রাট স্বয়ং উক্তস্থানে আগমন করেন। সুলতান মাহমুদকে সম্রাটের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সম্রাট তাকে যথাযোগ্য সমাদর কিংবা সম্মান প্রদর্শন করলেন না। সুলতান মাহমুদ নিজের আগমনের জন্য অনুতপ্ত হলেন। কিছুদিন পর অত্যন্ত দুঃখ বেদনায় তিনি পরলোকগমন করেন। শহর অভিমুখে যাত্রা করার জন্য সম্রাট তার বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন। তিরিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মূল রাজকীয় বাহিনী হতে সাত ক্রোশ পথ অগ্রবর্তী হয়ে যাত্রারাম্ভ করার জন্য সুলতান মহমুদের পুত্র মুয়িদ বেগ, ইব্‌রাহীম বায়জিদের পুত্র জাহাঙ্গীর কুলি, মীর নুরকা, তারদী বেগ, বারী বিলাস, মুবারক ফারমুলী ও অন্যান্য আমীরের প্রতি নির্দেশ দেয়া হল। সম্রাটের বাঙলা অভিমুখে যাত্রার সংবাদ পেয়ে শের খান গোপনে সামান্য সংখ্যক অশ্বারোহী নিয়ে প্রস্থান করলেন। সম্রাট পাটনায় পৌঁছলেন। সম্রাটের অগ্রবর্তী বাহিনী তখনও উক্ত স্থানে এসে পৌঁছায়নি। তাদের কয়েকজন গুপ্তচর একটি গ্রামে এসে উদ্যানের মধ্যে কয়েকজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। তারা একজন গ্রামবাসীর নিকট জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, অশ্বারোহী স্বয়ং শের খান। শের খানের নাম শুনেই তারা এত সতর্ক হয়ে পড়ল যে, বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা পর্যন্ত নিরূপণ করে দেখল না। গুপ্তচর দল মুয়ীদ বেগের নিকট ফিরে এসে বলল, 'শের খান অমুক গ্রামে শিবির স্থাপন করেছে। মুয়ীদ বেগ মনে করলেন যে, শের খান তাদের বাধা প্রদানের জন্য অবস্থান করছেন। তিনি সম্রাটের আদেশের জন্য লোক পাঠিয়ে উক্ত স্থানেই শিবির রচনা করলেন। অধিকতর তথ্য জানার জন্য তিনি একদল গুপ্তচর প্রেরণ করলেন। গুপ্তচর বাহিনী অনুসন্ধান চালানোর উদ্দেশ্যে বাগানের নিকবর্তী স্থানে এসে একটি অশ্বারোহীও দেখতে পেলো না। গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তারা তাদের দলপতির নিকট জানতে পারল যে, শের খান উক্ত অঞ্চলে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে ত্রস্তে মুনগীর অভিমুখে যাত্রা করেছেন। গুপ্তচরদল সন্ধ্যার

কাছাকাছি সময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাত আগত। সুতরাং শের খানের পশ্চাদ্ধাবন করার ব্যাপারে মোগল বাহিনীর বিলম্ব ঘটল। ঘারী গিরিসংকট অতিক্রম করার পর শের খানের সংগে শরীফ খান শিরওয়ানীর সাক্ষাৎ ঘটল। শিরওয়ানী পরিবারবর্গ নিয়ে রোহতাস যাচ্ছিলেন। শের খান তাকে বললেন,—'মুগল বাহিনী অতিশয় সন্নিকটে। সুতরাং ফিরে যাও।' সাইফ খান সম্রাটের বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি নিরূপণ করে শের খানকে বললেন, 'আপনার নিকট অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য রয়েছে। উভয় পক্ষের দূরত্বও অতি সংকীর্ণ। আপনাকে বন্দী করার জন্য সম্রাট প্রাণপণে চেষ্টা করবেন। আমার পরিবারদের নিয়ে আপনি গন্তব্যস্থলে গমন করুন। আগামীকাল আমি প্রবেশ পথ দখল করে নেব। দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ সুলতান বাহিনীকে আটকে রাখব। অতএব আপনি অধিক পথ এগিয়ে যেতে পারবেন এবং আপনার ও মোগল বাহিনীর মধ্যে দূরত্বও বৃদ্ধি পাবে।' শের খান বললেন— 'আমার জীবন রক্ষার জন্য তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।' সাইফ খান উত্তর দিলেন,— 'সকল মানুষই একরূপ নয়। পরিবারের নিরাপত্তার জন্য জীবন বিসর্জন দেয়া মানুষের কর্তব্য। প্রভুর জন্য সহচরদের নিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে আমি কুণ্ঠিত নই।' শের খানের সাথে গমন করার জন্য সাইফ খানকে তিনি বার বার পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু সাইফ খান পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সুতরাং শের খান সাইফ খানের পরিবার নিয়ে দ্রুত গতিতে লক্ষ্যস্থলে গমন করলেন। এভাবে তিনি মোগলদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে রেহাই পেলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর সাইফ খান ভ্রাতাদের স্নানকার্য সমাপন করার জন্য বললেন এবং নিজে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। ভাইগণ বললেন,— 'আপনি যখন জান দিতে প্রস্তুত তখন আমরাও আমাদের এক সহস্র জীবন আপনার জন্য বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নই। এখন কথা নয় কাজের সময়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ত্রুটি করব না।' তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গুগারগড়ের প্রবেশ পথ আগলে রাখলেন। সম্রাট বাহিনী নিকটবর্তী হওয়ার পর সাইফ খান প্রচণ্ড বিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দলে ভারী হওয়া সত্ত্বেও মোগলগণ গুগারগড়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন না। সাইফ খান ও তার অনুচররা বর্ণনাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। তারা মোগল বাহিনীকে মধ্যাহ্নের পরেও কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে

রাখলেন। সাইফ খানের অনুচরদের অধিকাংশ নিহত হল। তিনি নিজেও তিনটি স্থানে মারাত্মকভাবে জখম হলেন। অজ্ঞানাবস্থায় তিনি মুগলের হাতে ধরা পড়লেন। সৈন্যগণ তাকে মুয়ীদের সামনে আনয়ন করল। মুয়ীদ খান সাইফ খানকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করলেন। সম্রাট তাঁর বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়ে বললেন যে, সৈনিকদের এমনি হওয়া চাই এবং এমনিভাবে তারা যেন প্রভুর স্বার্থের খাতিরে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে। সম্রাট তখন সাইফ খানকে বললেন,—'আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি যেখানে খুশী যেতে পার।' সাইফ খান বললেন,—'আমার পরিবার শের খানের সংগে রয়েছে। আমি তার কাছে যেতে চাই।' সম্রাট উত্তর দিলেন,—'আমি তোমাকে জীবন দান করেছি। তুমি যা খুশী ইচ্ছা করতে পার। সুতরাং সাইফ খান শের খানের নিকট প্রত্যাবর্তন করলো।

শের খান মুঙ্গের পৌঁছলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন সুজাত খান। ওদিকে হুমায়ুনের বাহিনী এগিয়ে আসছিল মুঙ্গের অভিমুখে। সুতরাং সাইফ খানের পরিবারকে ঘারী দুর্গে পৌঁছে দিয়ে তারপর নৌকাযোগে গৌড়ে চলে যাবার জন্য শের খান সুজাত খানকে নির্দেশ দিলেন। সেখানে পৌঁছে সম্রাট বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য তিনি পুত্র জালাল খানকে পাঠালেন। ঘারীতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষে গৌড়ে সঞ্চিত ধনসম্পদ রোহতাসে পাঠিয়ে দিলেন। জালাল খান যখন ঘারী এসে পৌঁছলেন তখন সম্রাট বাহিনীও আর বেশী দূরে নেই। জালাল খান শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করতে চাইলেন। কিন্তু আমীর-ওমরাহগণ তাতে সম্মতি দিলেন না। তারা বললেন, 'শের খান যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়ার জন্য তাদের পাঠাননি। ঘারীর প্রবেশ পথে সম্রাটের অগ্রগতি রোধের জন্য তাদের পাঠানো হয়েছে মাত্র। কিন্তু জালাল খান তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে এক সহস্র অশ্বারোহীকে ঘারীতে রেখে নিজে ছয় সহস্র সৈন্য নিয়ে সম্রাট বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি বিজয় লাভ করেন। মোগল পক্ষের অধিনায়ক মুবারক ফারমুলী, আবুল ফতেহলাংগা এবং আরও বহু সৈন্য জালাল খানের হাতে নিহত হয়।

জালাল খান ঘারীতে প্রত্যাবর্তন করে প্রবেশ পথে সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করলেন। রাতের পর প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের দরুন রাস্তা-ঘাট

চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন ছিল বর্ষার প্রারম্ভ। অত্যধিক বর্ষার দরুন সম্রাট এক মাসের জন্য পথে আটকা পড়ে গেলেন। এই সুযোগে শের খান গৌড়ের অধিকৃত সমগ্র ধন-সম্পত্তিসহ ঝাড় খণ্ডের পথ ধরে রোহতাসে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে ঘারী ত্যাগ করে রোহতাসে আগমন করার জন্য জালাল খানকে নির্দেশ পাঠালেন। জালাল খানের ঘারী ত্যাগের খবর পেয়ে হুমায়ুন তার সৈন্য দলের একাংশকে মীরজা হিন্দালের নেতৃত্বে আগ্রা প্রেরণ করেন। তিনি নিজে বাংলার রাজধানী গৌড়ে গমন করে তথায় তিন মাস অবস্থান করলেন (হিজরী ৯৪৫, ইং ১৫৩৮-৩৯)। এই তিন মাস তিনি কাউকে সাক্ষাতের অনুমতি দেননি।

ইত্যবসরে শের খান বেনারস গমন করে তথাকার গভর্নরকে আক্রমণ করলেন। তারপর কাওয়াস খানকে পাঠালেন মুঙ্গের। সম্রাট হুমায়ুন গৌড়ে যাওয়ার সময় খান খানান ইউসুফ খাইলকে মুঙ্গের রেখে গিয়েছিলেন। খান খানানকে বন্দী করে শের খানের সামনে আনার জন্য কাওয়াস খানকে আদেশ দেয়া হল। কারণ, এই খানানই বাবরকে কাবুল থেকে ভারত আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন। কাওয়াস খান গভীর রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে খানানকে বন্দী করে বেনারসে নিয়ে আসেন। কিছুদিনের মধ্যেই বেনারস অধিকৃত হল। মোগলবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়। পরবর্তীকালে বাহরাইনে অভিযান চালনার জন্য হায়বত খান নিয়াজী, জালাল খান জালু, সারমাস্ত খান শিরওয়ানী ও অন্যান্য আমীরকে পাঠান হল। তারা ঐ অঞ্চল হতে মোগলদের বিতাড়িত করলেন। তারপর চাম্বল শহর পদানত করে তথায় লুণ্ঠনকার্য চালান। আর একদল সৈন্যকে জৌনপুরের দিকে পাঠানো হল। যুদ্ধে জৌনপুরের গভর্নর নিহত হন। উক্ত সৈন্য দলকে আগ্রা অভিমুখে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। সমগ্র দেশের মধ্যে যেসকল গভর্নর হুমায়ুনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আফগানদের হাতে নিহত হলেন কিংবা দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। ফলে চম্বল থেকে কণৌজ পর্যন্ত সকল জেলাই আফগানের পদানত হল। গভীর জঙ্গল কেটে মাহারঠার জমিদারকে বন্দী করার জন্য কাওয়াস খানকে প্রেরণ করা হয়। শের খানের কর্মচারিগণ এ সমস্ত অঞ্চলের হেমন্ত ও বসন্ত কালীন ফসলের কর আদায় করেন।

হুমায়ুন সংবাদ পেলেন যে, মীরজা হিন্দালের হস্তে শেখ বহলুল নিহত হয়েছেন এবং আগ্রার আশেপাশে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। এ সংবাদে হতবুদ্ধি হয়ে তিনি বাংলা হতে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন বর্ষার প্লাবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ দিকে শের খান মহারঠায় যুদ্ধরত একমাত্র কাওয়াস খান ব্যতীত বিহার, জৌনপুর ও অন্যান্য এলাকায় অবস্থানরত সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে রোহতাসে এসে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

সম্রাট হুমায়ুন তার বাহিনীকে নিয়ে এসে রোহতাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিবির স্থাপন করলেন। শের খান সকল আমীর-ওমরাহকে এক স্থানে সমবেত করে তাদের উদ্দেশে বললেন,—'বাংলাদেশে অধিককাল অবস্থানের ফলে সম্রাটের বাহিনীতে দারুন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আগ্রায় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব ঘটনা বিবেচনা করেই সম্রাট আমাকে অব্যাহতি দিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আপনারা যদি সম্মত হন তাহলে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি। বর্তমানে আমার সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত সুসংহত ও শক্তিশালী। সম্রাটের বাংলা অভিযানের পূর্বে আমি সর্বপ্রকারে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম। তাঁকে বাৎসরিক কর দিতেও স্বীকৃত হয়েছিলাম। তিনি যদি আমাকে বাংলা দেশ ছেড়ে দিতেন তাহলে আজ তার সংগে আমার শত্রুতা সৃষ্টি হত না। প্রথমে তিনি আমার হাতে বাংলার ভার অর্পণ করতে সম্মত হন। কিন্তু বাংলার শাসক সুলতান মাহমুদের দূত সম্রাটের নিকট গেলে তিনি আমার সংগে প্রতিশ্রুত সকল চুক্তি ভঙ্গ করেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমাকে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে। আমি বিহার ও জৌনপুরের মোগল বাহিনীকে ধ্বংস করে দেশগুলো দখল করে নিয়েছি। শান্তির সকল পথ এখন বন্ধ।' আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী (তিনি একদা সিকান্দারের আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরে শের খানের সঙ্গে যোগদান করেন) উত্তর দিলেন,—'মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সুলতান বহলুল ও সিকান্দারের আমীর-ওমরাহদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আপনার নেই। কারণ অতীতে আমরা যেসব পন্থা উদ্ভাবন করেছি দুর্ভাগ্যবশত তার প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যতবার আমরা যুদ্ধ করেছি, আত্মকলহের দরুন ততবারই পরাজিত হয়েছি।

সময় এখন আপনার অনুকূলে। সমস্ত আফগান একান্তভাবে আপনারে অধীনে সমবেত হয়েছে। তারা আজ মুগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সদা প্রস্তুত। অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাকে বলেছেন যে, আফগানরা শক্তি-সামর্থ্য কিংবা যুদ্ধবিদ্যায় মুগলদের চাইতে হেয় নয়। অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের জন্যই শুধু তারা পরাজিত হয়ে থাকে। সমস্ত আফগান যেদিন একই নায়কের অধীনে সমবেত হতে পারবে সেইদিন তারা মুগলদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হবে। আপনিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি। অন্যান্য আমীরের পরামর্শ নিয়ে তদনুসারে কার্যে প্রবৃত্তি হন। বিজয় আপনার করতলগত। এর বেশী কিছু আমার বলার নেই।'

আজম খানের বক্তব্য শোনার পর শেরশাহ কুতুব খান, হায়বত খান, জালাল খান বিন জানুই, সুজাত খান, সারমাস্ত খান শিরওয়ানী প্রমুখ আমীর-ওমরাহর মতামত জানতে চাইলেন। সকলেই একবাক্যে যুদ্ধের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কেননা এরূপ সুবর্ণ সুযোগ তাঁরা আর কখনো পাননি।

শের খান উপলব্ধি করতে পারলেন যে, আফগানরা তার অধীনে একতাবদ্ধ। তারা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তখন তিনি সম্রাটকে আক্রমণের জন্য রোহতাস পর্বত ত্যাগ করে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। যাত্রাপথের স্থানে স্থানে পরিখা খনন করলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরেসুস্থে পরিমিত পদক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। সম্রাট হুমায়ুন অচিরেই শেরশাহের আগমন সংবাদ পেয়ে যাত্রা স্থগিত রাখলেন। তিনি শের খানের বাহিনীর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

শের খান একথা শুনে সম্রাটকে জানালেন যে, সম্রাট যদি নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনে সন্তুষ্ট থেকে তার উপর বাংলাদেশের শাসন-ভার অর্পণ করেন তাহলে শের খানকে তিনি অধীনস্থ ভৃত্যরূপে পাবেন। তৎপর শের খান সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে একটি সুবিধাজনক স্থান বেছে নিলেন। স্থানটি ছিল একটি গ্রাম। উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর একটি জলধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। শের খান তথায় পরিখা খনন করে অবস্থান রচনা করলেন। উক্ত জলধারার প্রস্থ ছিল মাত্র পঁচিশ হাত। দ্রুত এসে শের খানের সংগে যোগদান করার জন্য মারহাট্টায় যুদ্ধরত খাওয়াস খানকে আদেশ করা হল। শের খানের পত্র পেয়ে সম্রাট তাকে

শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ দিতে রাজী হলেন। শর্তগুলো হল এই, যেহেতু শের খান রাজ্য সীমা লংঘন করছেন এবং নদীর অপর তীরে সম্রাটের মুখোমুখি শিবির স্থাপন করেছেন, সেহেতু সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য শের খানকে পিছনে হটে যেতে হবে এবং নদীর অপর তীরে সম্রাটের যাত্রা পথ করে দিতে হবে নদী অতিক্রম করার পর সম্রাট কিছুদূর অবধি শের খানের পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে পুনরায় পিছনে ফিরে আসবেন। শেরখান এসব শর্তে রাজী হলেন। তিনি নদীপথ মুক্ত করে পিছনে হটে আসলেন। সম্রাট নদী অতিক্রম করে অপর তীরে সমগ্র বাহিনী ও পরিবার বর্গ নিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন।

তিনি শেখ খলিল নামক ফরিদ শাকেরগঞ্জের এক উত্তরাধিকারীকে শের খানের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করলেন। শের খানকে বলা হল, তিনি যেন কোথাও বিলম্ব না করে রোহতাসে ফিরে যান। সম্রাট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি কিছুদূর পর্যন্ত শের খানকে অনুসরণ করে পুনরায় পেছনে সরে আসবেন। তৎপর চুক্তি অনুযায়ী শের খানের বার্তাবাহকের হাতে বাংলাদেশের ফরমানপত্র প্রদান করবেন। দূতের মুখে এ প্রস্তাব শুনে শের খান বিনাদ্বিধায় তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দূতকে মহা সমাদরে বরণ করা হল। শেরশাহ প্রথানুযায়ী কোন লৌকিকতা কিংবা শিষ্টাচার বাকী রাখলেন না। শেখ খলিল তাঁর অন্যান্য সাথীর সামনেই শের খানের সংগে আন্তরিক ও দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালালেন। তিনি শান্তি স্হাপনের জন্য জোর উপদেশ দিয়ে শের খানকে বললেন,—'আপনি যদি শান্তি স্থাপন করতে রাজী না হন। তবে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।' শের খান বললেন— 'আপনার প্রস্তাব আমার নিকট শুভলক্ষণ বৈ কিছুই নয়। ইনশাআল্লাহ্ যুদ্ধ আমি করবই।' আলোচনার পর শের খান শেখ খলিলকে অর্থ এবং মালদা ও বাংলাদেশের তৈরী বহুমূল্য পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। শের খান পারিতোষিক ও আন্তরিকতার বলে দূতের হৃদয় দখল করে নিলেন। শের খান তাকে আড়ালে ডেকে নিলেন। তৎপর পুণ্যশ্লোক শেখ শাকেরগঞ্জের প্রতি আফগানদের ভালবাসার কথা উল্লেখ করে এবং খলিলকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শের খান বললেন,—'আশা করি, সম্রাটের সংগে যুদ্ধ কিংবা শান্তি স্হাপন সম্পর্কে আপনি আমাকে মূল্যবান উপদেশ দেবেন। জ্ঞানীরা বলেছেন, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী পুণ্যবান লোকের নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করা উত্তম কাজ। আপনার মাঝে এসকল গুণের

সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে সূর্যের মত স্বচ্ছ মন নিয়ে বলুন, কিসে আমার মঙ্গল হবে। সম্রাটের সংগে যুদ্ধ কিংবা শান্তি এর কোন্‌টার মধ্যে আমার কল্যাণ নিহিত রয়েছে ?'

অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে শেখ খলিল বললেন—'আমার উপদেশ চেয়ে আপনি আমাকে দ্বিবিধ বিপদের সম্মুখীন করেছেন। প্রথমতঃ আমি আপনার নিকট সম্রাটের দূতরূপে আগমন করেছি। সুতরাং তাঁর অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু বলা ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, আপনি আমার উপদেশ চেয়েছেন। প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেছেন, শত্রুও যদি তোমার নিকট উপদেশ চায় তাহলে তাকে সৎপরামর্শ দান করবে। আমার মতের বিপক্ষে যদি আপনাকে পরামর্শ বিতরণ করি তাহলে তা হবে অসাধুতামূলক আচরণ। আফগানরা বংশ পরম্পরায় আমার পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অলৌকিক আদেশের বলেই ইহা সম্ভব হয়েছে। সৎ উপদেশ প্রদান-কারীকে তিনি অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। সুতরাং সত্য কথাটি ব্যক্ত করতে আমি বাধ্য। সম্রাটের সংগে শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যেই আপনার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সৈন্যবাহিনীতে এখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। সম্রাটের নিকট অশ্ব কিংবা গবাদিপশু নেই। ভ্রাতাগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করেছে। তিনি প্রয়োজনের খাতিরে এখন আপনার সংগে শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু শেষাবধি তিনি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন না। এখন আপনার সম্মুখে সৌভাগ্যের সুবর্ণ রেখা জ্বলজ্বল করছে। এ সুযোগ যদি একবার হাতছাড়া হয়ে যায় পুনরায় তা ফিরে আসবে না।' শের খান যুদ্ধ ও শান্তি এ দুয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান ছিলেন। কিন্তু শেখ খলিলের পরামর্শ পেয়ে তিনি শান্তি স্থাপনের সকল চিন্তা মন থেকে বিদায় দিলেন। যুদ্ধের জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়ে শের খান কাওয়াস খানকে ডেকে পাঠালেন এবং শের খান তাঁর সমগ্র বাহিনীকে সজ্জিত করার আদেশ দিলেন। ওদিকে মারাঠা বাহিনী তাদের আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছিল।

শিবির হতে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর শেরশাহ ফিরে এসে বললেন যে, মারাঠাগণ অনেক দূরেই অবস্থান করছে। গুপ্তচরের নিকটই তিনি এ খবর পেয়েছেন।

পরদিন তিনি পুনরায় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করে কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করলেন এবং বললেন যে, সেদিনও মারাঠা বাহিনী তাদের নিকট এসে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সকল আমীর-ওমরাহকে একত্রিত করে বললেন—'আমি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাটকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের কোন প্রতিদান তিনি দেননি। আমার সর্ব প্রকার আনুগত্য সত্ত্বেও সম্রাট আমার নিকট চুনার দুর্গ দাবি করলেন। দুর্গ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর তিনি তা জোরপূর্বক দখলের জন্য আমার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রেরিত সৈন্যদল পরাজিত হওয়ায় তিনি নিজেই দুর্গ আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু কারাগার থেকে মুহম্মদ জামানের পলায়ন ও বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পেয়ে সম্রাট উক্ত অভিযানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। অধিকন্তু গুজরাটের শাসনকর্তা সুলতান বাহাদুর দিল্লী আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এসব কারণে সম্রাট আমাকে আক্রমণ না করে ফিরে যেতে বাধ্য হন। গুজরাট অভিযানের প্রাক্কালে আমার পুত্র কুতুব খান সর্বদা সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। যদিও আমি জৌনপুর প্রভৃতি রাজ্য দখল করতে পারতাম তবু তা করে সম্রাটের বিরক্তিভাজন হতে চাইনি। কেননা সম্রাট অত্যন্ত শক্তিশালী। আমার হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি কখনো আনুগত্যের পরিপন্থী কোন কাজ করিনি। কোন কুকর্মেও লিপ্ত হইনি। তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়াই ছিল এর কারণ। কিন্তু গুজরাট থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আমার আনুগত্যের কোন মর্যাদা না দিয়ে আমাকে দেশ থেকে বিতাড়নের চেষ্টায় রত হন। কিন্তু ভাগ্য আমার অনুকূলে থাকায় তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমি সর্বতোভাবে তাঁর অনুগত ছিলাম। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। সমগ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সম্রাট বাংলা আক্রমণ করলেন। তাঁর উপর আমার সকল আস্থা অন্তর্হিত হয়েছে। ফলে সম্রাটের বিরুদ্ধে আমি শত্রুতায় লিপ্ত হলাম। চাম্বল সীমান্ত পর্যন্ত তার যত গভর্নর ছিল তাদের সবাইকে আমি বিতাড়িত করেছি। ঐসব অঞ্চলে একটি মুগলকেও অবশিষ্ট রাখিনি। এখন, কোন্ আশায় আমি সম্রাটের সংগে সন্ধি স্থাপন করব? তার বাহিনীতে এখন অশ্ব ও অন্যান্য গবাদিপশু এবং অস্ত্র-শস্ত্রের নিদারুণ অভাব রয়েছে। ভ্রাতারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এসব কারণে হুমায়ুন আমার সংগে শান্তি স্থাপন ও বন্ধুত্ব

প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তিনি আমাকে নিয়ে খেলতে চান। পরিশেষে তিনি সকল চুক্তি ভঙ্গ করবেন। বিদ্রোহ দমনের পর আগ্রায় পৌঁছে সৈন্যদল পুনর্গঠিত করতে পারলে তিনি আমাকে ধ্বংস করতে দ্বিধা করবেন না। অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা বুঝতে পেরেছি যে, মুগলদের চাইতে আফগানরা অধিকতর সাহসী। তাদের অনৈক্যের সুযোগেই মোগলগণ এদেশ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আফগান ভাইদের সম্মতি পেলে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি।' সমবেত জনতা উত্তর দিল,—'আপনার আশীর্বাদে আফগানদের অনৈক্য বিদূরিত হয়েছে। আমরা আপনার দ্বারা লালিত হচ্ছি। আপনাকে ঘিরে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত। সুতরাং আপনার বিজয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে আমরা একটুও কার্পণ্য করব না। সন্ধি ভঙ্গ করার যে সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত।' শের খান তদুত্তরে বললেন,—'আমি এসন্ধি ভঙ্গ করলাম। সর্ব শক্তিমানের উপর আমি আস্থাশীল। সম্রাট হুমায়ুনের সংগে আমি অবশ্যই যুদ্ধে লিপ্ত হব।' স্ব-স্ব বাহিনীকে অতি শীঘ্র সুসজ্জিত ও প্রস্তুত রাখার জন্য শেরশাহ আমীরদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। কেননা মারাঠা বাহিনীর আক্রমণ আশঙ্কা তখনো তিরোহিত হয়নি। শের খানের আদেশ মুতাবিক রাত্রির এক প্রহর অবশিষ্ট থাকতেই সমগ্র বাহিনী মারাঠা অভিমুখে আড়াই ক্রোশ পথ অগ্রসর হলেন। শের খান তখন তাঁর বাহিনীকে থামিয়ে বললেন—'দুদিনের জন্য আমার বাহিনীকে বের করে আবার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে ছিলাম, ফলে আমরা যে সম্রাটের শিবিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে না। এখন সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর দিকে মুখ ফিরাও। আশা করি আফগানরা সমর্যাদা পুনরুদ্ধারের এ সুযোগকে হাতছাড়া হতে দেবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা চরম নিষ্ঠার পরিচয় দেবে। কেননা হিন্দুস্থান পুনরুদ্ধারের ইহাই সুবর্ণ সময়। আফগানগণ উত্তর দিলেন,—'আপনি শীঘ্রই আমাদের উৎসর্গ ও নিষ্ঠার নমুনা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবেন।'

ফাতেহা শরীফ পাঠ করার পর সৈন্য দলকে নিয়ে শেরশাহ দুর্বার গতিতে সম্রাটের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্রাট শীঘ্রই জানতে পারলেন যে, শেরশাহ তাঁকে আক্রমণ করার জন্য মহাবেগে আগমন করছেন। শেরশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য সম্রাট মুগলবাহিনীকে আদেশ দিলেন।

ওযু করে কিছুক্ষণের মধ্যই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়লেন। শক্তি ও সাহসিকতায় সম্রাট ছিলেন সিংহ সমতুল্য। সুতরাং যৌবনের স্পর্ধা ও তুলনাহীন মুগলবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের গর্বে স্ফীত হয়ে তিনি আফগান বাহিনীকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন। এমনকি যুদ্ধকালীন সময়ে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন এবং তত্ত্বাবধানের দিকেও তিনি সম্যক নজর দিলেন না। বাংলায় অবস্থানকালে মোগলবাহিনীতে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। অপরপক্ষ যুদ্ধের সকল প্রকার কলাকৌশল শের খানের জানা ছিল। যুদ্ধ কিভাবে আরম্ভ ও শেষ করতে হয় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। জীবনের উত্থান ও পতন সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। আফগানরা ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে মোগল বাহিনী তাঁবু হতে বহির্গত হয়নি। শেরশাহের সৈন্যদল অপূর্ব সাহসিকতার সংগে বিনাদ্বিধায় মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করল। চক্ষের নিমেষে মুগলরা তাদের হস্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যুদ্ধ সমাপ্ত করার পূর্বেই হুমায়ুন খবর পেলেন যে, মুগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং তাদের একত্রিত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, সম্রাট তাঁর পরিবারবর্গ অপসারণ করার সময়টুকুও পেলেন না। সুতরাং তিনি আগ্রার দিকে পলায়ন করলেন। সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করবেন ইহাই ছিল সম্রাটের আগ্রা গমনের উদ্দেশ্য।

মসনদ-ই-আলা আমাকে (এ গ্রন্থের লেখক আব্বাস খান) বলেছেন যে, হুমায়ুনের বেগম যখন অন্যান্য রমণীকে নিয়ে পর্দা থেকে বেরিয়ে আসেন তখন (তিনি মসনদ-ই-আলা) শের খানের পার্শ্বেই অবস্থান করছিলেন। সম্রাজ্ঞীর উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ার পর শের খান অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করলেন। তৎপর তিনি নফল নামায আদায় করলেন। নয়ন জলে সিক্ত হয়ে অতি বিনয়ের সংগে হস্তোত্তলন করে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন ...। তৎপর তিনি সমগ্র বাহিনীর উপর আদেশ জারি করলেন যে, কোন মুগল মহিলা, শিশু কিংবা ক্রীতদাসীকে এক রাত্রির জন্যও শিবিরে বন্দী করে রাখা যাবে না। তাদেরকে সম্রাজ্ঞীর শিবিরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এ আদেশ এত কঠোরতার সংগে প্রয়োগ করা হল যে, কেউ এর বিরোধিতা করতে সাহস পায়নি। রাত হওয়ার পূর্বেই প্রতিটি মুগল মহিলাকে

সম্রাজ্ঞীর শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বরাদ্দ করা হয়। ফলে কিছু দিন পর হুসাইন খান নিরাকের তত্ত্বাবধানে সম্রাজ্ঞীকে রোহতাসে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যান্য মুগল মহিলাকে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও খরচ দিয়ে আগ্রায় প্রেরণ করলেন।

শের খানের সৌভাগ্য গগনে বিজয় তারা উদিত হয়েছে। সুতরাং রাজ্যের সর্ব প্রান্তে চিঠির মারফতে এ বিজয় সংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য মুনশী বা পত্রলেখকদের প্রতি আদেশ দিলেন। উমর খানের পুত্র ছিলেন মসনদ-ই-আলা ঈসা খান। তাঁর উপাধি ছিল খান ই-আজম। সুলতান বহলুলের রাজত্বকালে তাতার খান ইউসুফ খাইলের মৃত্যুর পর তিনি লাহোরের জায়গীর লাভ করেন। তিনি শের খানকে বললেন,—'বিজয় সংবাদ উল্লেখ করে আপনি যে চিঠি পাঠাচ্ছেন তা শাহী ফরমান হিসেবেই লিখিত হওয়া উচিত। শের খান মন্তব্য করলেন,—'আপনারা পূর্বে সুলতান বহলুল ও সিকান্দারের আমীর ছিলেন। আফগান জাতির মর্যাদার খাতিরেই আপনারা আমার সংগে যোগদান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আপনাদের নিকট ফরমান পাঠানো এবং আপনাদের দণ্ডায়মান রেখে সিংহাসনে আরোহণ করা আমার পক্ষে শোভা পায় না। পলায়ন করলেও সম্রাট এখনো জীবিত। রাজ্যের অধিকাংশই এখনো তাঁর অধীনে রয়েছে। ঈসা খান বললেন যে, শের খানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার এক প্রবল ইচ্ছা তার মনে জাগরূক রয়েছে। তিনি আরও বললেন,—'সুলতান সিকান্দার এবং তার উত্তরাধিকারিগণ কওমের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তাতে রাজকীয় প্রথাকে ভঙ্গ করা হয়েছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ যাকে রাজ্য দান করেছেন এবং অপরাপর মানুষের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন পূর্ববর্তী রাজকীয় রীতিনীতি ও শিষ্টাচার পালন করা তার জন্য অপরিহার্য।' তৎপর আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী বললেন,—'মোগলেরা দুই পুরুষ যাবৎ রাজত্ব করছে। আফগানরা তাদের কাছে ঘৃণিত। মুগলরা মনে করে যে, আফগান বাহিনী তাদের সমকক্ষ নহে। তবুও আপনার প্রজ্ঞার বলে আমরা তাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছি।' ...মিয়া বাবিন লোদী এবং অন্যান্য আফগান একই অভিমত জ্ঞাপন করে বলেন, 'আপনার বাহিনীর মধ্যে মসনদ-ই-আলা কালকাপুর শিরওয়ানী এবং আজম হুমায়ুনের সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁরা যা বলেছেন তা অত্যন্ত সঙ্গত। সুতরাং বিলম্বের কোন প্রয়োজন নেই।' শের খান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে

বললেন—'রাজ সিংহাসন একটি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত বস্তু। কিন্তু বিপদ ও দায়িত্বের সুকঠিন ঝুঁকি এর মধ্যে নিহিত। যেহেতু মহৎপ্রাণ বন্ধুরা আমাকে রাজকীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান সেহেতু আমি তাতে সম্মতি দিলাম।' সিংহাসনে আরোহণের শুভ মুহূর্ত নিরূপণ করার জন্য তিনি গণকদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তারা সময় গণনা করার পর উল্লসিত মনে বলল,—'সৌভাগ্যবশত সেই শুভলগ্ন এখনি উপস্থিত। আপনি যদি এই মুহূর্তে সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হন তাহলে আপনার সৈন্যবাহিনী কোনদিনই পরাজিত হবে না।' শেরশাহ সিংহাসনে উপবেশনে করলেন। তাঁর মস্তকের উপর রাজছত্র প্রসারিত করা হল। তিনি শেরশাহ উপাধি ধারণ করলেন। শেরশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হল। রাজ্যে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তিনি 'শাহ আলম' এই বিশেষ উপাধী ধারণ করলেন। তিনি ঈসা খানকে বললেন,—'আপনি শেখ মালাহির পুত্র। আমার নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচার করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বিজয় কাহিনী বর্ণনা করে আপনি নিজহাতে একটি পত্র লিখুন। অবশিষ্ট চিঠিগুলো মুনশিগণ লিখবেন।' সুতরাং ঈসা খান এক কপি পত্র লিখলেন। বাকী চিঠিগুলো মুনশীদের দ্বারা লিখিত হল। আনন্দের নমুনা হিসেবে দশদিনব্যাপী বাদ্য বাজানো হল। যুবকগণ আফগান রীতিতে নৃত্য করতে লাগল।

শের খান সম্রাট হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করে কালপি ও কনৌজ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করলেন। তিনি মারাঠা চেরুহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য তিনি পুনরায় খাওয়াস খানকে প্রেরণ করলেন। জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ছয় সহস্র অশ্বারোহীসহ বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। তাকে হত্যা করার জন্য আদেশ দেয়া হল। হুমায়ুনের সংগে অবস্থানকারী হিন্দু দলপতিকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু শেখ খলিলকে তিনি অন্যতম বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসেবে বরণ করে নিলেন। তিনি ঈসা খানকে গুজরাট ও মানডুতে প্রেরণ করে তথাকার প্রধানদের নিকট লিখে জানালেন,—'আমি আমার এক পুত্রকে আপনাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাঠাতে মনস্থ করেছি। হুমায়ুন কনৌজের অভিমুখে যাত্রা করলে আপনারা আমার পুত্রের সংগে মিলিত হয়ে আগ্রা ও দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অবরোধ ও লুন্ঠন করবেন।' এই সময় মাল্লু খান নামক একব্যক্তি কাদির শাহ নাম ধারণ করে নিজেকে মানডু, সারংপুর এবং উজ্জয়িনীর রাজা বলে ঘোষণা করেন। ভূপত শাহের

শিশুপুত্র রাজা প্রতাপের পক্ষ হয়ে রাইসিন ও চান্দেরী শাসন করছিলেন পুরান মল ভাইয়া সিকান্দার খান মিয়ানা সিওয়াস শাসেন করতেন। মহীশুর শাসন করতেন ভূপালের রাজা। মালওয়ার-এর সকল শাসনকর্তা শেরশাহের পত্রের উত্তরে লিখলেন যে, শেরশাহ যদি তাঁর পুত্রকে ঐ দেশে প্রেরণ করেন তবে তাঁরা সর্ব প্রকারে সাহায্য করবেন। মল্লুখান তার চিঠির অগ্রভাগে একটি চিহ্ন প্রদান করেন। শের খানের হাতে এ চিঠি পৌছার পরে তিনি উক্ত চিহ্ন ছিঁড়ে তাঁর পাগড়ির মধ্যে রেখেছিলেন। (স্নেহপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন)।

ঈসা খান যখন গুজরাট যান তখন সুলতান মাহমুদ ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কিন্তু তাঁর মন্ত্রী দরিয়া খান লিখলেন যে, রাজা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, রাজ্যের আমীরগণ নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত এবং এ সংকট মুহূর্তে খান খানান ইউসুফ খাইল মানদু ও গুজরাটের সমগ্র বাহিনী নিজের সংগে নিয়ে গেছেন। ঈসা খান শেরশাহকে জানালেন,—'এই লোকটির জন্যই আফগানরা বারবার বিপদে পতিত হয়েছে। ইউসুফ খাইল বাবরকে কাবুল থেকে ভারতে আনয়ন করেছিলেন। হুমায়ুন যদি তার পরামর্শে কাজ করতেন তাহলে আপনার সর্বনাশ সংঘটিত হত। কিন্তু আপনার সৌভাগ্যবশত হুমায়ুন ইউসুফ খাইলের উপদেশে সায় দেননি। তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে যদিও তিনি বন্দী তবুও তাকে বাঁচতে দেয়া উচিত নহে।' শের খান উত্তর দিলেন,—'আমি অনেকের সংগে এ বিষয়ে আলাপ করে দেখেছি। তাদের অভিমত হল, খান খানান আফগানদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, সুতরাং তাকে হত্যা করা সমীচীন হবে না।' কিন্তু ঈসাখান যে অভিমত পেশ করেছেন তাতে আমার সম্মতি রয়েছে।' সুতরাং খান খানানকে হত্যা করার জন্য আদেশ দেয়া হল। খান খানান তখন মুঙ্গেরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দৈনিক আধা সের আঁকাড়া বার্লি তাঁর খাওয়ার জন্য বরাদ্দ করে দেয়া হয়েছিল। অবশেষে তাকে হত্যা করা হল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, হুমায়ুন কোনৌজ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেরশাহ পুত্র কুতুব খানকে মানডু অভিমুখে প্রেরণ করলেন। ঐ রাজ্যের প্রধানদের সংগে মিলিত হয়ে দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা দখল ও লুণ্ঠন করার জন্য পুত্রের প্রতি আদেশ দিলেন। কুতুব খানের চান্দেরী গমনের সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন অন্যান্য আমীরসহ দুইভাই মীরজা হিন্দল এবং মীরজা আসকারীকে তথায় প্রেরণ করলেন। সম্রাটের

ভ্রাতাদের আগমনের খবর পেয়ে মালওয়ার প্রধানগণ কুতব খানকে কোনরূপ সহায়তা করলেন না। কুতুব খান চান্দেরী হতে চাউন্দা শহরে গমন করেন। তথায় মুগলদের সংগে যুদ্ধ করে তিনি নিহত হন। বিজয়ী মীরজা হিন্দল ও মীরজা আসকারী সম্রাটের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

কুতুব খানের মৃত্যু ও তাঁর প্রতি মান্দুর রাজাদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেয়ে শের খান অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তিনি ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ করলেন না। মান্দু-প্রধানদের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভকে তিনি মনের মধ্যে খোদাই করে রাখলেন। মুগলগণ এই বিজয়ে অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠলেন। হুমায়ুন বিপুল সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে কনৌজে আগমন করলেন (জিলকদ, ৯৪৬ হিজরী, এপ্রিল, ১৫৪০ খৃঃ)। শেরশাহও গঙ্গানদীর ওপারে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এই সংকটময় মুহূর্তে তিনি শুনতে পেলেন যে, মারাঠাপতি কাওয়াস খানের হাতে নিহত হয়েছেন। শের খান উল্লসিত হয়ে 'কাওয়াস খানের নিকট খবর পাঠালেন, অবিলম্বে আগমন কর। কারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই আমরা তোমার আগমনের জন্য গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।' কাওয়াস খানের আগমন বার্তা পাওয়ার পর শেরশাহ সম্রাটকে লিখে জানালেন, 'আমি প্রয়োজনের খাতিরে কিছুদিন এখানে অবস্থান করছি। এখন আপনি ইচ্ছা করলে নদীর এপারে এসে যুদ্ধ করতে পারেন। কিংবা আপনি যদি চান তাহলে আমিই নদী অতিক্রম করে ওপারে যুদ্ধের জন্য গমন করতে পারি। এই দুটোর যে কোন একটি পন্থা আপনি অবলম্বন করতে পারেন।' এ পয়গাম সম্রাটের নিকট পৌছার পর তিনি শের খানের দূতকে বললেন,—'শের খানকে বলবে তিনি যদি নদী তীর ছেড়ে কয়েক ক্রোশ পথ পিছিয়ে যান তবে আমি নদী অতিক্রম করতে পারি।' দূত ফিরে এসে শের খানের নিকট সম্রাটের বক্তব্য পেশ করলেন। শের খান নদী তীর থেকে কয়েক ক্রোশ পথ পিছিয়ে গেলেন। হুমায়ুন সেতু তৈরী করে নদী পার হলেন। হামিদ খান কাপুর নামক এক আমীর শের খানকে বললেন—"সমগ্র মোগল বাহিনী নদী অতিক্রম করার পূর্বেই তাদের আক্রমণ করা উচিত।' শের খান উত্তর দিলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতির জনাই এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতে আমাকে চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সর্বশক্তিমানের কৃপায় এখন আমার বাহিনী মোগলদের চাইতে কোন অংশে হেয় নয়। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি দিবসের এই প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না। কোনরূপ ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে আমি

প্রকাশ্য ময়দানেই শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করব। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অবশ্যই বাস্ত-বায়িত হবে।' সমগ্র মুগল বাহিনী নদী অতিক্রম করার পর শের খান সে দিকে ধাবিত হলেন। তিনি মোগলবাহিনীর বিপরীত প্রান্তে নিজস্ব রীতি অনুযায়ী মাটির প্রাচীর করে এর নিকটে শিবির স্থাপন করলেন।

কয়েকদিন পর কাওয়াস খানও এসে পড়লেন। ঐদিনই শের খান অগ্রগামী হয়ে রাজধানী হতে সম্রাটের সাহায্যার্থে সরবরাহকৃত তিনশ' উট, বহুসংখ্যক ষাঁড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দখল করলেন। ১০ই মুহররম উভয় পক্ষ ময়দানে নেমে এলেন। শের খান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করলেন। বাহিনীর মধ্যভাগে স্থান নিলেন শের খান নিজে ও হায়বত খান (আদম হুমায়ুন), খান নিয়াজি (মসনদই-ই-আলা ঈসা খান শিরওয়ানী), কুতব খান লোদী, হাজী খান, জালুই, বুলন্দ খান, সরমস্ত খান, সাইফ খান শিরওয়ানী, বিজলী খান এবং অন্যরা। দক্ষিণভাগে ছিলেন শেরশাহের পুত্র জালাল খান (তিনি শের খানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করে ইসলাম খান উপাধি ধারণ করেন), তাজ খান, সুলায়মান খান কররানী, জালাল খান জানুই প্রমুখ। বাহিনীর বাম দিক পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন শের খানের পুত্র আদিল খান, কুতুব খান, রাই হোসেন জালওয়ানী ও অন্যরা। সৈন্যবাহিনীকে উক্ত পদ্ধতিতে সমাবেশ করার পর শের খান তাদের বললেন,—'আপনাদের একতাবদ্ধ করার জন্য আমি চেষ্টার চূড়ান্ত করেছি এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য সর্বপ্রযত্নে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আজকের মত একটি দিনের জন্য আপনাদের এভাবে গড়ে তুলতে হয়েছে। আজ মহা পরীক্ষার দিন। যারা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিক্রম প্রদর্শন করবেন তাদের আমি সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদমর্যাদা দান করব।' আফগান বাহিনী উত্তর দিল—হে শক্তিমান রাজা, আপনি আমাদেরকে প্রকৃত আনুকূল্য দেখিয়েছেন এবং রক্ষা করেছেন। সুতরাং আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন ও প্রতিদান দেয়ার ইহাই উপযুক্ত সময়।' অতঃপর শের খান সেনাধ্যক্ষদেরকে স্ব-স্ব বাহিনীর নিকট ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে সমগ্র সেনাবাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং পূর্ব রচিত ব্যূহকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে দিলেন। মুগলসৈন্যরা কাওয়াস খানের হাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কিন্তু শের খানের ডানপার্শ্বস্থ জালাল খান পরিচালিত আফগান সেনা পরাজিত হল। অবশ্য জালাল খান নিজে, মিয়া আইয়ুব

কালকাপুর স্ব-স্ব অবস্থানে অবিচলিত থাকলেন। দক্ষিণভাগের এ ভগ্নদশা লক্ষ্য করে শেরশাহ স্বয়ং তথায় গমন করতে চাইলেন। কিন্তু কুতুব খান লোদী বাধা প্রদান করে বললেন,—'প্রভু, আপনি নিজের অবস্থান পরিত্যাগ করবেন না। অন্যথায় পিছনের সৈন্যরা ভাববে যে, আমাদের বাহিনীর মধ্যভাগও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। আপনি শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে গমন করুন।' শের শাহের বাহিনী সোজাসুজি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সুতরাং যে মোগল সৈন্যরা আফগানদের দক্ষিণভাগ পরাজিত করেছিল শের খান তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। সম্রাটের মোগল বাহিনী আফগানদের হাতে পরাজিত হল। ডান প্রান্তে জালাল খানের সম্মুখে ও বামপ্রান্তে কুতুব খানের সম্মুখে যেসব মোগল সৈন্য ছিল তারাও শের খানের প্রবল আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে পলায়ন করল। আফগান বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের যেসব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল তারাও এ সুযোগে সমবেত হয়ে সম্রাট বাহিনীকে ঘিরে ফেলল। এভাবে আফগান বাহিনী চতুর্দিক থেকে মুগলদের ঘিরে ফেলে। এ যুদ্ধে শের শাহের পুত্রগণ ও কতিপয় আমীর-ওমরাহ বিশেষত হায়বত খান নিয়াজী, কাওয়াস খান অতুলনীয় পরাক্রমের পরিচয় দেন। তারা রক্তমাখা ও জীবন-ঘাতী তলোয়ারের সাহায্যে মুগল বাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। সম্রাট হুমায়ুন স্বীয় অবস্থানে পর্বতের মত অটল রইলেন। তিনি যে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

সম্রাট শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এক অলৌকিক শক্তি তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মেনে নিলেন। অতি মানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে রাজধানী আগ্রায় ফিরে গেলেন। এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ও নিরাপদে পলায়ন করতে সমর্থ হন। তাঁর অধিকাংশ সৈন্যকে গঙ্গার দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

মুগলদের সঙ্গে যে ঝাপড়া শেষ হওয়ার পর শের খান বিহার ও রোহতাসের ফৌজদার সুজাত খানকে গোয়ালিয়র দখলের নির্দেশ দেন। শের খান বার্তাবাহককে বললেন,—'সুজাত খানের পুত্র মাহমুদ খান যুদ্ধে নিহত হয়েছে, রোহতাস ত্যাগের পূর্বে তাঁকে এ সংবাদ জানিও না। কেননা পুত্রের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি আমার আদেশ পালনে কালবিলম্ব করবেন।' ফরমান পেয়ে সুজাত খান গোয়ালিয়র অবরোধ করলেন। শেরশাহ

বার্মাজিদ-এর অধীনে এক বিশাল বাহিনী অগ্রিম পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সম্রাটের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে নিষেধ করা হয়। তিনি নাসির খানের অধীনে আর একটি বাহিনী চাম্বল অভিমুখে প্রেরণ করেন। কনৌজ পর্যন্ত ভূখণ্ড পদানত করার পর তিনি আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সম্রাট আগ্রায় পৌছে আমীর সাইদ আমীর উদ্দীনকে বললেন যে, আফগান বাহিনী তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি বরং এক অলৌকিক শক্তি আফগানদের পক্ষ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তিনি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। সম্রাট যখন সরহিন্দ গমন করেন তখন তিনি মহির উদ্দীন সরহিন্দের নিকটও উক্ত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। শেরশাহের আগ্রা আগমনের সংবাদ পেয়ে সম্রাট লাহোর অভিমুখে পলায়ন করেন। সম্রাটের পলায়নের সংবাদে শেরশাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি বার্মাজিদকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি কিছুদিন আগ্রায় অবস্থান করেন। সম্রাটকে অনুসন্ধান করার জন্য কাওয়াস খান ও বার্মাজিদকে বিপুল বাহিনীসহ লাহোরের দিকে পাঠানো হল। দিল্লী আগমনের পর চম্বলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অধিবাসিগণ নাসির খানের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শের খানের নিকট অভিযোগ করে।

শের খান কুতুব খানকে বললেন,—'কয়েকজন সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে বাছাই করে চম্বলে পাঠানো উচিত। তথাকার সরকারে বহু উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী ব্যক্তি রয়েছে। এসকল অবাধ্য লোককে দমন করতে সক্ষম এরূপ শক্তিমান লোকদের চম্বলে পাঠাতে হবে। কুতুব খান উত্তর দিলেন, এব্যাপারে ঈসা খান খালকাপুরের চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি আফগানদের মধ্যে আর দ্বিতীয়জন নেই। শের খান বললেন,—'তাই হবে। আপনি ঈসা খানের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে প্রস্তাব করুন। তিনি যদি সম্মত হন আমি তাকে চম্বলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করব। কুতুব খান এ প্রস্তাব পেশ করলে ঈসা খান তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মতি প্রদান করেন। চম্বল ছাড়াও শের খান ঈসা খানকে কন্ট এবং গোলা পরগনাদ্বয় দান করেন। পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তিনি ঈসা খানকে আদেশ দিলেন। নাসির খানকে তাঁর অধীনে নিয়োজিত রাখা হল। ঈসা খানকে বিদায় দানের সময় তিনি বললেন, 'দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিস্তৃত

সমগ্র ভূখণ্ড সম্পর্কে আমি এখন দুশ্চিন্তা মুক্ত। মসনদ-ই-আলা চাম্বলে পেঁছে দেখলেন যে, নাসির খান বইরাম বেগকে বন্দী করে রেখেছেন, বৈরাম বেগ ছিলেন হুমায়ুনের সিলমোহরের (Seal) জিম্মাদার। পরবর্তী-কালে আকবরের সময় এ ব্যক্তি খান খানান উপাধি লাভ করেছিলেন। বৈরাম বেগের চাম্বল অবস্থানের কারণ নিম্নে বিবৃত হল ঃ

হুমায়ুনের বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর বৈরাম বেগ মিয়া আজিজুল্লাহ্ দানিশমন্দের পুত্র মিয়া আবদুল ওহাবের সংগে বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য চাম্বল আগমন করেন। ওহাব ছিলেন চাম্বল শহরের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু নাসির খানের ভয়ে তিনি বৈরামকে শহরে রাখতে সাহসী হননি। তিনি তাকে লক্ষ্ণৌর রাজা মিত্র সেনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মিত্র সেন বৈরামকে রাজ্যের জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণ অংশে কিছু দিনের জন্য আশ্রয় দান করেন। নাসির খান এই খবর জানতে পারলেন। বৈরামকে চাম্বলে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মিত্র সেনকে নির্দেশ দিলেন। শের খানের ভয়ে তিনি রাজা বৈরামকে নাসির খানের হস্তে সমর্পণ করলেন। নাসির খান বৈরামকে হত্যা করতে মনস্থির করেন। সুলতান সিকান্দারের সময় থেকেই আবদুল ওহাব ও ঈসা খানের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তিনি ঈসা খানের নিকট গিয়ে নিষ্ঠুর নাসির খানের কবল থেকে বৈরামকে মুক্ত করার জন্য আরজি পেশ করলেন। ঈসা খান বৈরামকে মুক্ত করে নিজগৃহে কিছুদিনের জন্য স্থান দিলেন। তৎপর ভরণ-পোষণের জন্য তাকে একটি বৃত্তি প্রদান করেন। ঈসা খান রাজা মিত্র সেনের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করে বললেন যে, তিনি (ঈসা খান) শেরশাহের নিকট গমন করবেন তখন বৈরাম বেগকেও সংগে নিয়ে যাবেন। মান্দু এবং উজ্জয়িনী অভিযানকালে ঈসা খান শের খানের সংগে মিলিত হন। তিনি বৈরামকে সংগে নিয়ে যান এবং উজ্জয়িনীতে শের খানের সংগে তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। শের খান রাগতস্বরে জানতে চাইলেন যে, বৈরাম খান ঐ সময় কোথায় ছিলেন। মসনদ-ই-আলা বললেন যে, বৈরাম খান শেখ মালহী কাহালের গৃহে অবস্থান করতেন। শেরশাহ উত্তর দিলেন, 'যদি কোন অপরাধী আত্মীয়দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাকে ক্ষমা করার রীতি আফগানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমি বৈরাম খাকে মার্জনা করলাম। শেরশাহের দরবার ত্যাগের প্রক্কালে ঈসা খান বললেন,—'শেখ মালহীর মর্যাদার খাতিরে আপনি বৈরামকে জীবন দান

করেছেন। আমি তাকে আপনার দরবারে আনয়ন করেছি। সুতরাং আমার খাতিরে তাকে সম্মানসূচক পোশাক ও একটি অশ্ব প্রদান করুন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ সমর্পণকারী মুহম্মদ কাসিমের সংগে তাঁকে তাঁবু তৈরী করার অনুমতি দিন। শের খান উজ্জয়িনী থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে মুহম্মদ কাসিমের পাশে বৈরাম খানের জন্য একটি স্থান বরাদ্দ করে দিলেন। কিন্তু বৈরাম বেগ ও মুহাম্মদ কাসিম উভয়েই গুজরাটে পলায়ন করেন। মুহম্মদ কাসিম পথেই নিহত হন। বৈরাম বেগ গুজরাটে পেঁাছতে সমর্থ হলেন। গুজরাটে শেখ গদাই নামক এক ব্যক্তি অবস্থান করতেন। বৈরাম বেগ তাঁর অধীনে কিছুদিন নিষ্ঠার সংগে কাজ করেন। তৎপরে তিনি গুজরাট ত্যাগ করে সম্রাট হুমায়ুনের নিকট চলে যান।

সম্রাটের মৃত্যুর পরে তিনি খান খানান উপাধিতে ভূষিত হন এবং শেখ গদাই, শেখ আবদুল ওহাব ও মিত্র সেনকে সর্ব প্রকার আনুকূল্য প্রদর্শন করে পূর্ববর্তী উপকারের প্রতিদান প্রদান করেন। ঈসা খান তখনও জীবিত, বয়স নব্বই বছর। খান খানানের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে অনেকেই পরামর্শ দান করে। তদুত্তরে মসনদ-ই-আলী বললেন,—'পার্থিব কোন বস্তুলাভের আশায় আমি মুগলের দ্বারস্থ হব না। উপকারের প্রতিদান গ্রহণ করা মসনদ-ই-আলা-উমর খানের পুত্রের নীতির বহির্ভূত।' মৌলানা মুহম্মদ বিনর, আবদুল মোমিন এবং তাঁর শ্যালক ছিলেন খান খানানের অন্যতম সুহৃদ। তাঁরা খান খানানের নিকট জিজ্ঞেস করলেন—মসনদ-ই-আলা ঈসা খান কি কখনো আপনাকে কোন দয়া দেখিয়েছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঈসা খান একদা আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি যদি আমার নিকট আগমন করেন তাহলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব। শেরশাহে অপেক্ষা বেশী কিছু দিতে না পারলে ও অন্ততঃ আমি তাকে চম্বল রাজ্য প্রদান করব।'

আমি (আব্বাস খান, এই পুস্তকের রচয়িতা) এবং মসনদ-ই-আলা ঈসা খান খাজকাপুর একই গোত্রে ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। মোজাফফর খান ছিলেন মসনদ-ই-আলার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেছি। এ গ্রন্থে আমি যে ইতিহাস বর্ণনা করছি।' তার অধিকাংশ তথ্য খানে আজম মোজাফফর খানের নিকট থেকেই প্রাপ্ত। হিন্দুস্থানের পূর্ববর্তী এক আমীর ওমরাহ ছিল তাঁর পূর্ব পুরুষ। ঈসা খানের পিতা হায়বত খান সুলতান

সিকান্দর কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ার পর মান্দুর রাজা সুলতান মাহমুদের নিকট গমন করেন। তথায় তিনি সুলতানের পরামর্শদাতা ও বন্ধুরূপে বরিত হন। সুলতান মাহমুদকে ত্যাগ করে তিনি যখন গুজরাটের রাজা মোজাফ্ফরের নিকট গমন করেন সেখানেও তাকে রাজার পরামর্শ দাতা ও বন্ধুরূপে স্থান দেয়া হয়। সুলতান অবিশ্বাসীদের নিকট হতে মান্দু দুর্গ দখল করার পর মসনদ-ই-আলাকে বললেন,—'সুলতান মোজাফ্ফরের নিকট গিয়ে তাঁকে মান্দু সফর করার জন্য আহবান কর। কেননা ইহা অত্যন্ত মনোরম স্থান। সুলতান মোজাফ্ফর তদুত্তরে বললেন,—'মান্দু সুলতান মাহমুদের জন্য সৌভাগ্য আনয়ন করতে পারে। তিনি এখন এর মালিক। আমি প্রভুর খাতিরে, তাঁর সাহায্যার্থে তথায় গমন করেছিলাম। শুক্রবারে আমি দুর্গে গিয়ে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করব।' ঈসা খান এ শুভ সংবাদ সুলতান মাহমুদের গোচরীভূত করলেন। পরবর্তীকালে গুজরাট ত্যাগ করে ঈসা খান সুলতান ইব্রাহীমের নিকট গমন করেন। ইব্রাহীম তাকে অন্যতম পারিষদ হিসেবে নিয়োগ করেন। সুলতান তাঁর হস্তে দিল্লী শহরের শাসনভার ন্যস্ত করেন। সুলতান বহলুলের পুত্র সুলতান আলা-উদ্দীন দিল্লী হতে বিতাড়িত হওয়ার পর তাঁর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঈসা খান বিরুদ্ধপক্ষের নিকট দিল্লী সমর্পণ করেন নি। পরে তিনি শের খানের নিকট গমন করে অন্যতম আমীররূপে বরিত হন। দিল্লী অধিকারের পর শের খান তাঁকে চম্বল প্রদান করেন। একথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হাজী খানের হস্তে মেওয়াটের ভার ন্যস্ত করে শেরশাহ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সরহিন্দের নিকটে পৌঁছার পর তিনি উহার শাসনভার কাওয়াস খানের হস্তে অর্পণ করেন। কাওয়াস খান ক্রীতদাস ভগবন্তকে সরহিন্দ দান করেন।

হুমায়ুন ক্রমে লাহোরে এসে উপনীত হলেন। দেশ থেকে সদ্যাগত কতিপয় মোগল (যারা আফগানদের সংগে পূর্বে লড়েনি) সম্রাটকে এসে বলল,—'আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের অনুমতি দিন। তারা কিভাবে আমাদের সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারে তা যুদ্ধের ময়দানে দেখে নেব।' সম্রাট ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আফগানদের বিরুদ্ধে এসব লোককে প্রেরণ করলেন। কাওয়াস খান ও বার্মাজিদ শের খানের পূর্বেই লাহোর রওনা হয়েছিলেন। সুলতানপুর নামক স্থানে তারা মোগল বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল। মোগল সৈন্য পরাজয় বরণ করে

লাহোরে আশ্রয় নিল। কাওয়াস খান সুলতানপুরে অবস্থান করলেন। কিন্তু সম্রাট হুমায়ুন ও মীরজা কামরান লাহোর ত্যাগ করে পলায়ন করেন। শেরশাহ অচিরে লাহোর পদানত করলেন। তিনি লাহোরে অবস্থান না করে সম্মুখে অগ্রসর হন। তৃতীয় দফা আক্রমণের পর তিনি শুনতে পেলেন যে, হুমায়ুন জুদ পর্বতের পথ ধরে কাবুল গমন করছেন এবং সিন্ধুর তীর ধরে মুলতান অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। শেরশাহ কুসাব গমন করলেন। সেখানে থেকে সম্রাটকে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি কুতুবখান বেনেট, কাওয়াস খান, হাজী খান, হাবীব খান, সারমাস্ত খান, জালাল খান জালুই, ঈসা খান নিয়াজী, বার্মাজিদ এবং অধিকাংশ সৈন্যকে মুলতান অভিমুখে প্রেরণ করলেন। হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে তাকে রাজ্য সীমা থেকে বহিষ্কার করে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য শের খান আফগান বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁরা খবর পেলেন যে, মোগল বাহিনী দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ সংবাদে আফগান বাহিনী দারুণ দুশ্চিন্তায় পতিত হলেন। কেননা, শের খানের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাছাড়া হুমায়ুন কর্তৃক আফগানদের আক্রমণ করার আশঙ্কাও রয়েছে। অতএব আফগান সেনাদল দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল কাওয়াস খান ও ঈসা খানের নেতৃত্বে নদী অতিক্রম করে ঝিলামের পথ বেয়ে মুলতান অভিমুখে গমন করল। কুতুব খান ও অবশিষ্ট সৈন্য দল নিকটবর্তী নদীর তীর ধরে এগিয়ে গেলেন। যে দলটি সম্রাটের মূলবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে কাবুলের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল তারা কাওয়াস খানের সম্মুখীন হল। কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় মোগলবাহিনী রণবাদ্য ও পতাকা ফেলে পালিয়ে গেল। পরিত্যক্ত দ্রব্যসমূহ কাওয়াস খানের হস্তগত হল। আফগান বাহিনী উক্ত স্থান থেকে ফিরে এসে শের খানের সঙ্গে মিলিত হলেন। শেরশাহ কিছুদিন কুসাবে অবস্থান করলেন। তথায় ইসমাঈল খান, ফতেহ খান এবং গাজী খান বালুচ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি গাজী খান বালুচকে অশ্বসমূহ চিহ্নিত করার নির্দেশ দিলেন। ইসমাঈল খান বললেন,—'অন্যান্য ব্যক্তি তাদের অশ্বকে চিহ্নিত করে থাকে। কিন্তু আমি নিজ দেহকেই তপ্ত শলাকা দিয়ে চিহ্নিত করব।' শের খান তাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। নিজ দেহ চিহ্নিত করা থেকে তাকে বিরত করলেন। ইসমাঈল খানকে সিন্ধুর শাসনভার দেয়া হল। রোহের প্রতিটি পরিবার ও প্রধান ব্যক্তি শেরশাহের সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। গ্রন্থকারের পিতামহ

শেখ বায়জিদ কলকাপুরও এসে শের খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন। শেখ বায়জিদ ছিলেন পুণ্যবর শেখ আহমদ শিরওয়ানীর উত্তর পুরুষ। শেখ আহমদ ছিলেন শেখ মালহী কায়ালের পিতামহ। শেখ মালহী চরিত্রবল ও সাধুতার জন্য সমগ্র রোহ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রায় সকল আফগানই তাঁর শিষ্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর বংশধরগণ তপস্যা, ধর্মনিষ্ঠা, বীরত্ব ও সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ। সম্মান ও প্রতিপত্তিতে কোন ব্যক্তিই তাঁদের অতিক্রম করতে পারেনি। মহত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য মালহী ও তার বংশধরগণ সমগ্র আফগান জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন।

যেসব রাজার ইতিহাস আমি এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি তাঁদের প্রত্যেকেই শেখ বায়জিদকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। শেরশাহও তাঁর প্রতি অনুরূপ শিষ্টতা প্রদর্শন করবেন কিনা সে বিষয়ে বায়জিদ সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু শেখ বায়জিদ দরবারে গমন করার পর শেরশাহ কয়েক কদম এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। তিনি নিজেকে অত্যন্ত বিনীত ও হেয় করে বায়জিদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। আমার পিতামহ প্রত্যাশা করেছিলেন যে, শেরশাহ তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে শের খান বললেন—'আমাকে আলিঙ্গন করুন।' বিদায়ের প্রাক্কালে শের খান তাঁর প্রতি সর্বপ্রকারে সম্মান প্রদর্শন করলেন। বায়জিদ বাংলা অভিমুখে গমন করলে শের খান তাঁকে পুনরায় রোহে প্রেরণ করলেন, সঙ্গে দিলেন এক লাখ নগদ টাকা ও বাংলার রেশমী পরিচ্ছদ। শেখ বায়জিদ শেরশাহকে বললেন,—"লংগাদের রাজত্বকাল থেকে বেলুচীরা আমার পূর্ব পুরুষদের নিষ্করভাবে জমি ভোগ করছেন।" বালুচরা অন্যায়ভাবে শিরওয়া-নীদের যে জমি দখল করেছিল তার ন্যায়সংগত অধিকারী শেখ বায়জিদের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য শের খান ইসমাঈল খান বালুচকে নির্দেশ দিলেন। তৎপরিবর্তে ইসমাঈল খান বালুচকে গক্কর রাজ্যের নিন্দুনা পরগনা দান করা হল। ইসমাঈল খান এ আদেশ অমান্য করতে সাহসী হলেন না। সুতরাং তিনি নিন্দুনা পরগনা গ্রহণ করলেন। উজ্জয়িনী ও সরাংপুর অভিযানের সময় শেখ বায়জিদ দ্বিতীয় বারের জন্য শের খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শেরশাহ তাঁকে ভাটপুর পরগনায় দুই হাজার বিঘা জমি দান করেন। এ জমিগুলো তাঁর পূর্ব পুরুষের জন্যও বরাদ্দ ছিল। শেরশাহের সঙ্গে

সাক্ষাতের নযরানাস্বরূপ বায়জিদের জন্য এক লাখ টাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হল। ভবিষ্যতে কালিঞ্জর দখলের পর শেখ বায়জিদকে সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশ দান করার প্রতিশ্রুতিও জ্ঞাপন করলেন।

শেখ বায়জিদের মৃত্যুর পর আমার পিতা শেখ আলী রোহে অবস্থান করতেন। তিনিও একবার ইসলাম খানের সংগে সাক্ষাৎ করেন। ইসলাম খান তাকে অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং বরাদ্দকৃত সম্পত্তি পূর্ববৎ বহাল রাখেন। আফগানের রাজত্বকালে ২১ ইলাহী সন (৯৪৭ হিজরী পর্যন্ত) আমিও উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করেছি। তারপর আমাকে ৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব দিয়ে তাঁর সামনে হাযির করা হয়। কিন্তু কাযী আলী আকবরের নিকট আমার ও আমার পূর্ব পুরুষদের সত্যিকার পরিচয় না দিয়ে আমাদের সম্বন্ধে কুৎসা তুলে ধরেন। কাযী আলী বললেন— 'শেখ আবদুন নবী দু'জন আফগানকে দু'সহস্র বিঘা ভূমি দান করেছেন।' মোট কথা, দুর্ভাগ্যবশত সম্রাটের আদেশক্রমে বরাদ্দকৃত ভূমি আমার নিকট থেকে ফেরত নেয়া হয়। গুজরাটের রাজধানী সৈয়দ মীরানের পুত্র ও সৈয়দ মুবারকের দৌহিত্র সৈয়দ হামিদের শিষ্য খান খানান আমার ও আমার পূর্ব পুরুষের সত্যিকার পরিচয় জানতে পারলেন। তিনি বললেন,— আমার এ বেকারত্ব যাপন সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু আমি চাকরি গ্রহণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি মীর হামিদকে বিনা আমন্ত্রণে আমার গৃহে আনয়ন করলেন। মীর হামিদ আমাকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন যে, আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারলাম না। সুতরাং আমি অমাত্য প্রধান মীর সৈয়দ হামিদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করলাম। মাসিক দুইশ' টাকা তিনি আমাকে বেতন দিলেন ও অন্যবিধ দয়া প্রদর্শনে কার্পণ্য করলেন না। সর্বশেষে অদৃষ্টের দোষে কতকগুলো জরুরী কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বাজওয়ার প্রেরণ করেন। কিছুদিন পর মীর হামিদ নিহত হন। ফলে আমি নিদারুণ দুঃখে পতিত হলাম।

শেরশাহ রোহ থেকে আগত জ্ঞাতিদেরকে আশাতিরিক্ত অর্থ ও সম্পত্তি প্রদান করতেন। সারাং গক্কর শেরশাহের নিকট সাক্ষাৎ করতে আসেন নি। সুতরাং শেরশাহ সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে পড়মান ও গরজাক পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হলেন। গক্করদের দমিয়ে রাখার জন্য একটি দুর্গ

নির্মাণের উপযোগী স্থান বাছাই করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। উক্ত অঞ্চল থেকে শের খানের প্রস্থানের পর কাবুল রাস্তার সন্নিকটে সৈন্যদল রাখার জন্যই তথায় একটি দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। শের খান রোহতাসকেই উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়ে তথায় দুর্গ নির্মাণ করলেন। তিনি গক্করদের আক্রমণ চালিয়ে তাদের শৃঙ্খলিত করলেন। সারাং গক্করের বন্দিনী কন্যা কাওয়াস খানের হস্তে প্রদান করেন। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, বাংলার সুবাদার খিযির খান বাইরাক, বাংলার পরলোকগত রাজা সুলতান মাহমুদের কন্যাকে বিবাহ করে সে দেশে রাজাদের প্রথানুযায়ী 'চৌকী'তে উপবেশন করেছেন। চৌকী শব্দ দ্বারা একটি উচ্চতর স্থান বোঝায়। এ সংবাদে শের খান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিপদ ঘনিয়ে ওঠার পূর্বেই তার মূলোচ্ছেদের জন্য হায়বত খান নিয়াজী, হাবীব খান, রাই হোসেন জালওয়ানীকে রোহতাস দুর্গে রেখে শেরশাহ স্বয়ং বাংলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। শের খানের বাংলায় আগমনের পর খিযির খান সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এলে তিনি তাঁকে বললেন,--'আমার বিনা অনুমতিতে আপনি কেন সুলতান মাহমুদের মেয়েকে বিবাহ করে বাংলার রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী চৌকীতে উপবেশন করেছেন? রাজার অনুমতি ব্যতীত আমীরদের কোন কাজ করার অধিকার নেই।' শের খান খিযির খানকে শাস্তিস্বরূপ শৃঙ্খলিত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, 'যদি কোন আমীর সম্রাটের বিনানুমতিতে অনুরূপ কাজ করে তবে তাকেও খিযির খানের মত শাস্তি ভোগ করতে হবে। শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করলেন। কাযী ফাযীলতকে (কাযী ফাযীলত নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ) বাংলার আমীর নিযুক্ত করে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। আগ্রায় পৌঁছার পর সুজাত খানের একটি পত্র তাঁর হস্তগত হল। সুজাত লিখেছেন যে, নিম্নলিখিত শর্তে গোয়ালিয়র দুর্গের অধিপতি মুহাম্মদ কাসিম সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন: আফগানদের দুর্গে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। শেরশাহের শিবিরে মোগলদের সহজ গমনাধিকার থাকবে। শেরশাহের গোয়ালিয়র আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মদ কাসিম শেরশাহের সমীপে হাযির থাকবেন এবং শেরশাহের প্রতিনিধির হাতে দুর্গে সমর্পণ করবেন।

এসব শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে শেরশাহ উত্তর দিলেন, তার বাহিনী শীঘ্রই মান্দুতে অভিযান চালাবেন। মান্দুর শাসকবর্গ পূর্বে কুতুব খানকে সাহায্য করেনি। তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য।

এ সময়ে মান্দু স্বাধীন নরপতিদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। মাল্লু খান কাদির শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সাদমাবাদ শহর, মান্দুদুর্গ, উজ্জয়নী, সারাংপুর এবং রণথম্বোর শাসন করতেন। দ্বিতীয়ত সিকান্দর শাহ শাসন করতেন মিয়ানা সিওয়াম এবং হিন্দিয়া, তৃতীয়ত ভূপত শাহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র প্রতাপ শাহের প্রতিভূ হিসেবে চান্দেরী এবং রাইসিস শাসন করছিলেন রাজা পুরান মল, চতুর্থত বিজয়গড় ও তামহার শাসক ছিলেন ভূপাল।

শের শাহের গোয়ালিয়র আগমনের পর মুহাম্মদ কাসিম (তিনি এক সময় হুমায়ুনের অমাত্য ছিলেন) এসে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন ও গোয়ালিয়র দুর্গ সমর্পণ করেন। শেরশাহ গাগরুন এসে পৌঁছলেন। রাইসিনের পুরনো মলকে শেরশাহের নিকট আনয়ন করার জন্য সুজাত খান গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহকে প্রেরণ করলেন। পুরনো মল জানিয়ে দিলেন যে, সুজাত খান যদি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন তবে তিনি আসবেন। সুতরাং সুজাত খান রাইসিনে গিয়ে পুরনো মলকে শেরশাহের সমীপে হাযির করলেন। রাজা পুরনো মলের প্রিয়তমা পত্নী রত্নাবলী সুজাত খানের নিকট বলে পাঠালেন,—'পুরোনা মল ফিরে আসার পর আমি অনশন ভঙ্গ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ফিরে না আসেন আমি ততক্ষণ দুর্গ প্রাচীরে বসে তার আগমনের প্রতীক্ষা করব।' সুজাত খান রত্নাবলীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে পাঠালেন যে, পুরনো মল পরদিন তার কাছে ফিরে যাবেন। সুজাত খান অনধিক চল্লিশ বছর বয়স্ক ছয় হাযার অশ্বারোহীসহ পুরনো মলকে শেরশাহের নিকট আনয়ন করলেন। সম্রাট ১০০ অশ্বারোহী ও ১০০ জমকালো পরিচ্ছদ প্রদান করে পুরনো মলকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পুরনো মল তাঁর ভ্রাতা চতুরভূজের নিকট যাত্রা করার জন্য তিনি শের খানের নিকট থেকে বিদায় নিলেন।

শের খান শেরেনাগপুরে পদার্পণ করলেন। মাল্লু খানের প্রতিনিধি অভিবাদন জ্ঞাপন করে বললেন যে, তাঁর মনিব শের খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য শীঘ্রই এসে পড়বেন। শেরশাহের আদেশে সুজাত খান মাল্লু খানকে বরণ করে আনলেন। শেরশাহ শিবিরের বাইরে এসে প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন করলেন। মাল্লু খানকে তাঁর সম্মুখে আনয়ন করা হল। মাল্লু খান কোথায় শিবির ফেলেছেন সে সম্পর্কে শের খান জানতে চাইলেন। মাল্লু খান উত্তরে বললেন, 'আমি একাকী আপনার কাছে হাযির হয়েছি। আপনার দরবারই

আমার বাসস্থান। আশা করি এখানে অবস্থান করার অনুমতি পাব।' সুজাত খান বললেন যে, মাল্লু খান দুইশ' অশ্বারোহী সঙ্গে এনেছেন। মাল্লুখানের জন্যে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের শিবির, বিছানা, চন্দ্রাতপ, অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার জন্য শের খান প্রয়োজনীয় নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন। সারাংপুর থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে শের খান তার সমগ্র বাহিনী মাল্লু খানকে প্রদর্শন করলেন। মাল্লু খান ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি এতবড় বাহিনী স্বচক্ষে দর্শন করেননি। আফগান বাহিনী প্রতিটি স্তরে পরিখা খনন করতে করতে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের শ্রমনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা দর্শন করে মাল্লু খান বললেন,— 'এক আশ্চর্যজনক পরিশ্রম ও উদ্দীপনার মাঝে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এক মুহূর্তও আপনাদের বিশ্রাম নেই, আরামকে আপনারা হারাম করেছেন।' সৈন্যগণ একথার উত্তরে বললেন, 'এটাই হচ্ছে আমাদের প্রভুর রীতি। একজন সৈনিকের উচিত যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তার দলপতির নির্দেশকে কার্যকরী করা। প্রভুর আদেশকে প্রতিপালনের জন্য কোন কাজকেই কষ্ট বলে স্বীকার করা যাবে না। আরাম-আয়েশ নারীর জন্য। সম্মানিত পুরুষের পক্ষে ইহা চরম লজ্জার বস্তু।'

উজ্জয়নী যাত্রাপথে শেরশাহ কালিদহে তাঁবু স্থাপন করলেন। সিকান্দর খান মিয়ানা এসে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। শেরশাহ মান্দুর শাসনভার সুজাত খানের হস্তে সমর্পণ করলেন। মাল্লু খান সত্যিকারভাবেই অস্ত্র সমর্পণ করেছেন একথা ভালভাবে উপলব্ধি করার পর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। মাল্লু খানের হস্তে কালপীর শাসনভার অর্পণ করা হল।

মাল্লু খান নিজ পরিবারবর্গকে উজ্জয়নীর বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি বিবেচনা করে দেখলেন যে, শের খানের নিকট থাকতে হলে যে পরিশ্রম, উদ্দীপনা ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তার নেই। সুতরাং তিনি কলে-কৌশলে শিবির থেকে পালিয়ে যাবার ফন্দি আঁটলেন। একজন হিন্দু ক্রীতদাসের মত তিনি পালিয়ে যেতে মন স্থির করলেন। শেরশাহ এ দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁকে বন্দী করে রাখার জন্য সুজাত খানকে আদেশ দিলেন। মাল্লু খানের প্রতিনিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য গুপ্তচরদের বলা হল। মাল্লু খান চালাক লোক। ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে তা টের পেয়ে তিনি সুজাত

খানকে বললেন,—'রাজাকে বলুন যে, পরিবারবর্গকে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার কোন বাহন নেই।' 'সুজাত খান এ কথা শের খানের গোচরীভূত করলেন। মাল্লু খানের পরিবারকে বহনের জন্য একশ' উট একশ' খচ্চর, (পরিচালকসহ) ও কতিপয় গরু-গাড়ীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হল।

মাল্লু খান উট, খচ্চর ইত্যাদি ও তাদের চালককে সঙ্গে নিয়ে নিজ শিবিরে উপস্থিত হলেন। তিনি চালকদের মধ্যে উগ্র সুরা বিতরণ করলেন। সুরা পান করার পর তারা মাতাল ও অচেতন হয়ে পড়ল। এ সুযোগে মাল্লু খান ধন-সম্পদ ও পরিবার নিয়ে পলায়ন করলেন। দিনের বেলা এ পলায়নের খবর প্রকাশ হয়ে পড়ল। শের খান বললেন, 'ক্রীতদাস মাল্লু খান আমার সঙ্গে কিরূপ প্ররোচণা করেছে তা তুমি দেখেছ।' . . . শের শাহ সুজাত খানের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। মাল্লু খানের অনুসন্ধানের জন্য তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মাল্লু খান যেখানেই যাক না কেন, তাকে ধরে আমার কাছে আনয়ন কর। তাকে বন্দী করার জন্য তোমাকে বলেছিলাম। আমার নির্দেশ পালন না করে তুমি গাফলতি প্রকাশ করেছ।' সুজাত খান পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু তিনি নিষ্ফল হয়ে মান্দুর সীমান্ত হতে ফিরে এলেন। মাল্লু খান গুজরাটের সুলতান মাহমুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পূর্বেই সমগ্র মান্দু রাজ্যের ভার সুজাত খানের হস্তে অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুব্ধ শেরখান তাকে উক্ত রাজ্য হতে বঞ্চিত করে তৎপরিবর্তে চার সহস্র অশ্বারোহী রক্ষণের উপযোগী সিওয়াস ও হিন্দিয়া পরগনা প্রদান করলেন। দরিয়া খান গুজরাটি ছিলেন সুলতান মাহমুদের উজীর। তিনি পালিয়ে শের খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শের খান তাঁকে উজ্জয়নী প্রদান করেন। আলম খান লোদীকে দিলেন সারাংপুর। তিনিও সুলতান মাহমুদের আমীর ছিলেন।

হাজী খান এবং জুনায়েদ খানকে সারাংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করে তাঁদেরকে ধীর শহরে রেখে শেরশাহ স্বয়ং রণথম্বোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথে সিওয়াসের প্রাক্তন শাসক শেরশাহের দল থেকে পালিয়ে যান। উসমান খান (পূর্ববর্তী নাম আবুল ফারাহ) মাল্লু খানের পক্ষে রণথম্বোরের সুবাদারের কার্যভার চালাচ্ছিলেন। শেরশাহের আগমনের পর তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। উসমান খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিল খানের হস্তে রণথম্বোরের শাসনভার প্রদান করে শেরশাহ আগ্রায় ফিরে যান।

মান্দু ত্যাগ করে শের শাহ যখন দিল্লী গমন করলেন, তখন সিকান্দর খান মিয়ানার ভাই নাসির খান ছয় হাযার অশ্বারোহী এবং দুইশ' রণহস্তী নিয়ে সুজাত খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সুজাত খানের নিকট ছিল মাত্র দুই হাযার অশ্বারোহী। নাসির খান অনুচরদের বললেন,—'সুজাত খানকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী কর। তাঁকে আমি সিকান্দর শাহের প্রতিভূ হিসেবে রাখব। শেরশাহ যখন সিকান্দর শাহকে মুক্তি দেবেন তখনই আমি সুজাত খানকে মুক্ত করব।' নাসির খানের অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে সুজাত খান তাকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে গেলেন। উভয়পক্ষ নীলগড়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দুই পক্ষের আংশিক সৈন্য পলায়ন করে। মিয়া উমর, সৈয়দ তাহির ও কোকা নামক তিন ব্যক্তি শুধু মাত্র সুজাত খানকে আক্রমণ করার জন্য শপথ গ্রহণ করে। তিন জনের মধ্যে একজন তরবারির সাহায্যে সুজাত খানের কণ্ঠে আঘাত করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্শা দিয়ে সুজাত খানের মুখে আঘাত করে। ফলে তাঁর সম্মুখের দন্তপাটি উৎপাটিত হয়। তৃতীয় ব্যক্তি ছোরা দিয়ে তাকে আহত করল। তৎপর তাঁর মস্তকের কেশ ধরে নাসির খানের নিকট জীবন্ত ধরে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সুজাত খান তরবারির সাহায্যে উক্ত সৈনিকের বাহু কেটে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। সুজাত খানের সমগোত্রীয় আজহার খানের হস্তে দ্বিতীয় অশ্বারোহী নিহত হল। তৃতীয় ব্যক্তি মুবারক খান শিরওয়ানীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এভাবে সুজাত খান উদ্ধার পেয়ে পরাজিত প্রায় সেনাবাহিনীতে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। তাঁর দলের যে সকল সৈনিক দিগ্‌বিদিক পালিয়ে গিয়েছিল ক্রমশ তারা এসে পুনর্বার সমবেত হল। অতএব সুজাত খানের ভাগ্যাকাশে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হল। নাসির খান পালিয়ে গেল। পরিত্যক্ত দুইশ' রণহস্তী সুজাত খানের হস্তগত হল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় সুজাত খানের উন্নত শিরে বিজয়-কিরিট শোভা পেল। তিনি নীলগড় থেকে হিন্দিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শীঘ্রই সুজাত খান জানতে পারলেন যে, মাল্লু খান মান্দুতে সৈন্য সমাবেশ করে হাজী খানকে ঘেরাও করে ফেলেছেন। সুজাত খানের ক্ষত তখনও ভালভাবে সারেনি। তবুও তিনি হাজী খানকে উদ্ধারের জন্য দুশ' হস্তী নিয়ে যাত্রা করলেন। প্রাচীরের বহির্ভাগে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ

হল। আফগান বীরবৃন্দ এ যুদ্ধে অতুলনীয় শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করল। সুজাত খান বিজয় লাভ করলেন। মাল্লু খান গুজরাটে পালিয়ে যান। এ খবর শের খানের গোচরীভূত হলে তিনি হাজী খানকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন এবং বার সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব প্রদান করলেন। সুজাত খানকে দেয়া হল উজ্জয়নী, মান্দু, সারাংপুর ও মানসুরের জায়গীর। বিহার খান, মির খান নিয়াজী ও শামস খানকে দেয়া হল সিওয়াসের শাসনভার। এ তিন ব্যক্তি ছিলেন সুজাত খানের আত্মীয়। সুজাত খান সমগ্র মান্দুর শাসনভার অর্জন করলেন।

শেরশাহ আগ্রা হতে বাংলা ও বিহার অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কয়েকবার বললেন,—'বাংলা যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ভুল করেছি। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে রোগমুক্ত হই তাহলে দ্রুত গতিতে ফিরে যাব। পুরনো মল চান্দেরী মুসলমান পরিবারকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করেছেন। তাদের কন্যাকে তিনি বাঈজীর হীন জীবন যাপনে বাধ্য করেছেন। আমার পুত্র কুতুব খান তার কোন সাহায্য পায়নি। তাকে আমি এমন শাস্তি প্রদান করব যা অন্যের কাছে নজীর হয়ে থাকবে। ফলে আর কোন বিধর্মী মুসলমানের উপর অত্যাচার করার দুঃসাহস দেখাবে না।' আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে শের শাহ জ্বর মুক্ত হলেন। তিনি দুর্নিবার গতিতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাগমনের পর তিনি ৯৫০ হিজরীতে রাইসিন অধিকার করেন। বিজয়ী বাহিনী নিয়ে অগ্রগমনের জন্য তিনি পুত্র জালাল খানকে নির্দেশ দিলেন। জালাল খান বইলসা এসে পৌঁছলেন। শের শাহও তথায় এসে পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি দুর্বার বেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রাইসিন দুর্গের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হলেন। ভাইয়া পুরোনমল শের খানের বিরুদ্ধে ৬০০০ সৈন্যসহ এক হস্তীবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করলেন না। শেরশাহ রাইসিন অবরোধ করলেন। এমন সময় কাওয়াস খানের নিকট হতে খবর এল যে, তাঁর এবং হায়বত খানের মধ্যে মতবিরোধ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ের নিকট দু'জন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য তিনি শের খানকে অনুরোধ জানালেন। হায়বত খান ও কাওয়াস খানের এই মনোমালিন্যের খবর পেয়ে শের খান ঈসা খান ও হাবীব খানকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবের শাসনকার্যে হায়বত খানকে স্থিরভাবে বহাল করলেন। ফতেহ জং খানকে তাঁর সহযোগী হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

ফতেহ জং খান কাইরুলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। মোগল আমলে পানিপথ অবধি আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র দেশে লুটপাট করেন। বেলুচিগণ মুলতান রাজ্য নিজেদের কুক্ষিগত করেছিলেন। সুতরাং এসব লোকদের কঠোর শাস্তি দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মুলতানের সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের জন্য শেরশাহ হায়বত খানকে নির্দেশ দিলেন। তখন চাখার রিন্দের দুত ছিলেন সাতগড়ের শাসক। শের খানের ফরমান পেয়ে হায়বত খান তাঁকে বললেন,—'চাখার রিন্দকে বল যে, আমি তাঁর রাজ্যে পদার্পণ করব। তিনি যেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকেন এবং আমার সঙ্গে মিলিত হন। কারণ আমি মালহা অবরোধ করব।'

প্রত্যুষে হায়বত খানের আগমনের সংবাদ পাওয়া গেল। চাখার তাকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নিজে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করলেন। হায়বত খান তাকে দেখে বললেন,—'আমি আপনার সৈন্য দলকে নিয়ে দিপালপুর গমন করব। বিলম্ব হলে ফতেহ খান পালিয়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যেই তিনি পাট্টানে উপস্থিত হলেন। তার আগমন সংবাদে ফতেহ খান পলায়ন করলেন। হায়বত খান তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ফতেহ খানের সঙ্গে ছিল পরিবার ও মহিলা। সুতরাং তিনি বুঝতে পারলেন যে, হায়বত খানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। কারোর ও ফতেহপুরের নিকটে ছিল মৃত্তিকা নির্মিত একটি দুর্গ। ফতেহ খান সেটা দখল করলেন। ওদিকে হায়বত খান তার অনুসন্ধানে এসে উক্ত দুর্গ অবরোধ করলেন। ফতেহখান কয়েকদিন দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। অবশেষে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়ে তিনি কুতুব আলম শেখ ফরিদের পুত্র শেখ ইব্রাহীমকে হায়বত খানের নিকট মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠালেন। শেখ ইব্রাহীম হায়বত খানের নিকট এসে বললেন,—'আমি শেরশাহের একজন ভৃত্য। প্রভু যা নির্দেশ দেবেন আমার পক্ষে তা অবশ্য পালনীয়।'

হায়বত খান ফতেহ খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। রাত্রিকালে হিন্দু বেলুচী তিনশ' সৈন্যসহ দুর্গের বাইরে এসে অতর্কিতে অবরোধকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাত্রি অবসানের পর আফগান বাহিনী দুর্গ দখল করে নিলেন। অধিকাংশ সুন্দরী মহিলাকে বেলুচীরা স্বহস্তে হত্যা করে।

আফগানগণ অবশিষ্ট মহিলাকে ক্রীতদাসী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। হিন্দু বেলুচ ও বকসু লিংগার্থ আফগানদের হাতে বন্দী হল। হায়বত খান বেলুচী কর্তৃক লুণ্ঠিত মুলতান শহরে গমন করলেন। তিনি শহরের পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাগরিকবৃন্দ আবার শহরে এসে সমবেত হল। হায়বত খান অধিকৃত রাজ্যের অবস্থা, ফতেহ খান, হিন্দু বেলুচ এবং বকসু লিংগার্থের গ্রেপ্তার সম্পর্কিত সকল ঘটনা শের শাহের গোচরীভূত করলেন। এ শুভ সংবাদ পেয়ে শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি হায়বত খানকে মসনদ-ই-আলা এবং আজম হুমায়ুন উপাধিতে বিভূষিত করেন। শেরশাহ তাকে একটি লোহিত বর্ণের তাঁবু প্রদান করলেন এবং মুলতানে পুনরায় জনবসতি স্থাপন ও লংগাদের রীতি প্রতিপালনের উপদেশ দিলেন। জমির পরিমাপ না করে উৎপাদ-নের আনুপাতিক হিস্যা রাজস্ব হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি লিখে জানালেন। হিন্দু খান এবং হিন্দু বেলুচকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিলেন। বকসু লংগাকে সব সময় সাথে সাথে রেখে তাকে স্বীয় জেলার শাসনভার স্থায়ীভাবে অর্পণ করার জন্য বলা হয়। আজম হুমায়ুন এ আদেশনামা পেয়ে ফতেহ জঙ্গ খানকে মুলতানে রেখে লাহোরে আগমন করলেন। তিনি ফতেহ খান ও হিন্দু বেলুচকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

ফতেহ জং খান পুনরায় মুলতানকে জনবসতিপূর্ণ করে তুললেন। তাঁর হাতে নগরী বিপুলভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল এবং পূর্ববর্তী আমলের সমৃদ্ধিকে ও তা ছাড়িয়ে গেল। মুলতানে তিনি শেরগড় নামক একটি নতুন শহরের পত্তন করেন। শেরশাহ যখন রাইসিন অবরোধ করেন তখন তিনি আফগানদেরকে শেরগড়ে যেতে নিষেধ করেন। কেননা কৌশল ও দূরদর্শিতা বলে উক্ত শহর অধিকার করাই তাঁর ইচ্ছা।

একদা আফগানদের কতিপয় অনুচর একত্রে বসে ভাইয়া পুরনো মলের সৈন্যবাহিনীর শৌর্যবীর্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় রত ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই বলল যে, আফগানরা পুরনো মলের বাহিনীর সমকক্ষ নয়। কেননা পুরনো মলের সৈন্যরা প্রতিদিন দুর্গের বহির্ভাগে এসে বলে, "আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম এরূপ কোন ব্যক্তি শেরশাহের সৈন্য-বাহিনীতে নেই।' এই কথা শুনে কোন আফগান সৈন্য ভয়ে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসত না।

অনুচরদের এসব উক্তি আফগানদের মনে ক্ষোভের ঝড় তুললো। এ নিন্দাবাদকে গৌরবের ঔজ্জ্বল্যে মুছে দেবার জন্য তারা বলল—'শেরশাহ যদি আমাদের শিরশ্ছেদ করে কিংবা দেশ থেকে বিতাড়ন করে দেয় তবুও আমরা পুরনো মলের বাহিনীর সঙ্গে লড়ব এবং তাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করব।'

পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই ১৫শ' অশ্বারোহী নির্ধারিত স্থানে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তারা পুরনো মলকে বলে পাঠালেন,—'আপনার লোকেরা প্রতিদিন বীরত্বের গর্ব প্রকাশ করে। আমরা পনের শত অশ্বারোহী শেরশাহের বিনা অনুমতিতে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছি। আপনার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসুন, যুদ্ধের মাধ্যমে একবার শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক। কার কতখানি শক্তি তা যুদ্ধেই নির্ধারিত হবে।' নিজ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে পুরনো মলের সুউচ্চ ধারণা ছিল। আফগান বাহিনী তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এটাই ছিল পুরনো মলের ধারণা। চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার জন্য তিনি বিখ্যাত ও সাহসী বীরদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে নিজে তোরণ শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেন। রাজপুত ও আফগা–নের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। দিনের প্রথম প্রহর অবধি একদল অপর অপরদলকে পিছু হটাতে সক্ষম হল না। পরিশেষে আফগান বাহিনীর বিক্রমে রাজপুতগণ পিছু হটতে থাকে। উভয় পক্ষ যুদ্ধে যে শৌর্যবীর্য প্রকাশ করল তা ভাষার বর্ণনাতীত। শেষে সর্বশক্তিমানের কৃপায় আফগান বাহিনী বিজয় লাভ করল। তারা বিপক্ষদলকে দুর্গে ফটক অবধি তাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়। রাজপুত বাহিনী ফটকের কাছে এসে পুনরায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আফগান বীরের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে তারা দুর্গের অভ্যন্তরে পলায়ন করে। আফগান বীরবৃন্দ বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন।

অনুচরদের এ বীরত্বের কথা শুনে শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে এরূপ যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়ায় প্রকাশ্যে তাদের কঠোর সমালোচনা করলেন। কিছুদিন পর তিনি তাদের প্রত্যেককে প্রচুর পুরস্কার ও জায়গীর প্রদান করে বললেন, 'তোমরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছ তা আমি সম্যকরূপে উপলব্ধি হয়েছি। এখন আমার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ কর। এ দুর্গের আমি কি দশা ঘটাই তা অচিরেই দেখতে পাবে।"

এই বলে তিনি শিবিরে যত পিতল আছে তা এনে কামান (ডিঘা) তৈরীর নির্দেশ দিলেন। আদেশ মুতাবিক সবাই থালা, বিভিন্ন পাত্র, বাজার ও তাঁবুর সমস্ত পিতল এনে তা দিয়ে কামান তৈরী করল। অতঃপর শেরশাহ দুর্গ লক্ষ্য করে একই সঙ্গে কামান দাগার আদেশ দিলেন। দুর্গের চতুর্দিকে ভগ্ন হয়ে যাওয়ায় পুরনো মল সতর্ক হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর তিনি দুর্গ থেকে বেরিয়ে শের খানের নিকট আগমন করলেন। শের খান তাকে বললেন, 'আপনি যে সকল মুসলমান পরিবারকে দাসত্বে নিয়োজিত করেছেন তাদের যদি মুক্তি দেন তাহলে আমি আপনার হস্তে বেনারসের শাসনভার অর্পণ করব।' পুরনো মল উত্তর দিলেন, 'এ ধরনের কোন পরিবার আমার দাসত্ব নেই। আমি রাজাও নই। রাজার সহকারী মাত্র। আমি আপনার প্রস্তাব তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি। দেখি তিনি কি উত্তর প্রদান করেন।' শের খান তাঁকে রাজার নিকট যাওয়ার অনুমতি দিলেন। দুর্গে ফিরে যাওয়ার পর পুরনো মল সমগ্র মণিমানিক্য একত্র করলেন এবং শেরেখানের নিকট লোক মারফত বলে পাঠালেন, 'পুনরায় আপনার সম্মুখে যাওয়ার সাহস আমার নেই। আপনি প্রথম দুর্গ ছেড়ে সম্মুখে এগিয়ে যান। তারপর আমি বেরিয়ে এসে আপনার সৈনিকদের হাতে দুর্গভার ছেড়ে দেব এবং অন্য রাজ্যে গমন করব। আপনার পুত্র আদিল খান ও কুতুব খান যদি ধনেজনে আমাকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করার আশ্বাস দেন তাহলে আমি মহিলা ও পরিবারবর্গকে নিয়ে দুর্গের বাইরে আগমন করব।' শেরশাহ পুরনো মলের প্রস্তাবের কথা আদিল খান ও কুতুব খানকে জানিয়ে দিলেন। পুরনো মলের কথায় রাজী হয়ে তাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হল। কুতুব খান বেনেট দুর্গে গমন করলেন। কোনরূপ ক্ষতি না করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তিনি পুরনো মলকে পরিবারবর্গসহ রাইসিন দুর্গের বহির্ভাগে নিয়ে আসেন। কুতুব খান পুরনো মলের তাঁবুর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। শের খান আফগান বাহিনীর তাঁবুর মধ্যস্থিত স্থানে পুরনো মলের তাঁবুর স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। কুতুব খান স্বয়ং পুরনো মলের সঙ্গে উক্ত স্থানে গমন করলেন।

কিছুদিন পর চান্দেরীর পতিহারা নারী, দলপতি ও অন্যান্য ব্যক্তি রাস্তার পাশে শের খানের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। শের খান নিকট-বর্তী হওয়ার পর তারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকে। তিনি এসকল ব্যক্তি

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাদের নিকটে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তারা শের খানকে বলল, 'আমরা বিধর্মী শাসকের স্বেচ্ছাচার ও নির্যাতনে অমানুষিক ও অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। তিনি আমাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছেন, কন্যাদের দাসী কিংবা নর্কতীতে পরিণত করেছেন। অনেক দিন থেকে তিনি আমাদের ভূমি ও অন্যবিধ পার্থিব সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি যদি প্রতিকার না করেন তাহলে রোজ কিয়ামতের দিন আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করব। এ অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করে ন্যায়পরায়ণ শাসক শেরশাহের দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, 'ধৈর্য ধারণ করুন, কেননা আমি তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েই আমার সঙ্গে এনেছি।' অত্যাচারিত জনতা উত্তর দিলেন, আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করুন। শেরশাহ তাঁবুতে ফিরে আসলেন। মুসলমানদের উপর পুরনো মলের অত্যাচারের কাহিনী তিনি আলেমদের নিকট বিবৃত করে শাস্তি সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাইলেন। আমীর শেখ রফিক উদ্দীন এবং অন্যান্য আলেম পুরনো মলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ফতোয়া দিলেন।

রাত্রিকালে সৈন্যবাহিনী ও হস্তী নিয়ে একই স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য ঈসা খান ও হাবীবকে আদেশ দেয়া হল। কেননা শেরশাহ দ্রুতগতিতে পণ্ডওয়ালী অভিমুখে অভিযান চালনা করতে ইচ্ছুক। ভাইয়া পুরনো মল যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য হাবীব খানকে গোপন নির্দেশ দেয়া হল। শের শাহের এ মতলব সম্পর্কে কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও একটি কথা যাতে জানতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান করে দেয়া হল। হস্তী ও সৈন্যবাহিনী নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর শের খানের নিকট খবর পাঠানো হল। শেরশাহ আদেশ দিলেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই ভাইয়া পুরনো মলের শিবির পরিবেষ্টন করতে হবে। শিবির ঘেরাও-এর খবর পেয়ে পুরনো মল স্ত্রী রত্নাবলীর শিবিরে গমন করলেন। রত্নাবলী তখন মধুর স্বরে হিন্দি গান গাচ্ছিলেন। পুরনো মল স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করে অনুচরদের নিকট এসে বললেন,—'আমি স্ত্রী রত্নাবলীকে হত্যা করেছি, তোমরাও নিজেদের স্ত্রী ও পরিবারকে হত্যা কর। হিন্দুরা যখন নিজেদের নারী ও পরিবার হত্যায় নিরত তখন আফগান বাহিনী চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে। পুরনো মল ও তাঁর অনুচরবৃন্দ বিনা প্রতিবাদে মেষশাবকের মত চক্ষের নিমেষে প্রাণ বিসর্জন দিল। যে সমস্ত

মহিলা ও পরিজন নিহত হয় নাই, তাদের বন্দী করা হল। পুরনো মলের এক কন্যা ও তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনা হয়। অবশিষ্ট সকলকেই হত্যা করা হল। শেরশাহ বাজারে বাজারে নাচানোর জন্য পুরনো মলের কন্যাকে কতিপয় বাজীকরের হাতে তুলে দিলেন। অত্যাচারীর বংশ যাতে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য মলের ভ্রাতুষ্পুত্রকে খোজা করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি রাইসিনের শাসনভার মুন্সী শাহবাজ আচা খাইল শিরওয়ানীর হস্তে সমর্পণ করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করলেন। শেরশাহ রাজধানীতে সমগ্র বর্ষাকাল যাপন করলেন।

বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর তিনি প্রধান প্রধান অমাত্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বললেন যে, তিনি হিন্দুস্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত। আমীর ওমরাহগণ বললেন,—'দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালানোই এখন যুক্তিসঙ্গত। কেননা কয়েকজন বিদ্রোহী ক্রীতদাস তথা প্রভুর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। শিয়াদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত হয়ে তারা সুন্নীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। দাক্ষিণাত্যে ক্রমবিকাশমান শিয়া ধর্মমতের মূলোচ্ছেদ করা শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। শেরশাহ উত্তর দিলেন,—'আপনারা বলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি সুলতান ইবরাহীমের সময় থেকে বিধর্মী জমিদারগণ এ ইসলামী রাজ্যকে অবিশ্বাসীদের দ্বারা পূর্ণ করে ফেলেছে। মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহকে তারা দেবালয়ে পরিণত করেছে। এভাবে তারা দিল্লীর মালওয়ারের জমিদারী গ্রাস করে ফেলেছে। নিজ দেশকে বিধর্মীদের অশুভ কবল থেকে রক্ষা না করা পর্যন্ত আমি অন্যদেশে যাব না। প্রথমত আমি অভিযুক্ত বিধর্মী মলদেওকে উচ্ছেদ করব। যে ছিল নাগর ও আজমীরের শাসকের ভৃত্য। শাসক মহোদয় ভৃত্যকে অগাধ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কুটিলমনা ও অকৃতজ্ঞ ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করে। অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে রাজ্যসমূহ দখল করে নিয়েছে। পারিষদবর্গ শের খানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। ৯৪৬ হিজরীতে (১৫৪৩-৪৪খ্রীঃ) শেরশাহ তাঁর অগণিত সৈন্যবাহিনীকে নাগর আজমীর ও যোদপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন।

আমি শেখ মুহাম্মদ, খান আজম এবং মোজাফ্‌ফরের নিকট শুনেছি, এ অভিযানে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য যোগ দিয়েছিল যে, দক্ষ গণনাকারিগণ

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে ব্যর্থ হন। সমগ্র বাহিনী স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য আমরা কয়েকবার উঁচুতে আরোহণ করেছিলাম। কিন্তু বাহিনী এত বিশাল ছিল যে, তার পরিধি সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এরূপ বিশাল বাহিনী পূর্বে কখনো দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন কিনা, এসম্পর্কে আমরা বয়োবৃদ্ধদের কাছে জানতে চাইলাম। বৃদ্ধরা 'না'-সূচক উত্তর প্রদান করলেন। শের খান আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রীতে পৌঁছে সেনাবাহিনীর প্রতিটি ডিভিশনকে যুদ্ধার্থে একত্রে অগ্রসর হতে এবং প্রত্যেক বিরতিস্থলে পরিখা খনন করার নির্দেশ দিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বালুকাময় সমতল ভূমিতে একদিনের জন্য শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বালুর জন্য তথায় পরিখা খননে অসমর্থ হন। এ পরিস্থিতিতে কি কৌশলে পরিখা খনন করা যায় শেরশাহ তা ভাবছিলেন। এমন সময় শেরশাহের দৌহিত্র মুহম্মদ খান এসে বললেন, 'জাঁহাপনার আদেশ পেলে বস্তার মধ্যে বালি ভর্তি করে তৎসাহায্যার্থে পরিখা খনন করতে পারি।' শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দৌহিত্রের উদ্ভাবিত পন্থার প্রশংসা করলেন। বালিভর্তি বস্তা দ্বারা চতুর্দিকে প্রাচীর সৃষ্টি করে মধ্যবর্তীস্থানে পরিখা খনন করা হল। শত্রুর নিকটবর্তী হওয়ার পর শেরশাহ একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি মালদেওর পদস্থ লোকদের কাছে এই মর্মে পত্র পাঠালেন: 'প্রজাদের দুশ্চিন্তামুক্ত রাখবেন। আমরা মালদেওকে অবরোধ করে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করব।' শেরশাহ পত্রটি রেশমী খামে পুরে এক ব্যক্তির হাতে দিয়ে তাকে মালদেওর প্রতিনিধির শিবিরের নিকটবর্তী স্থানে গমন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সুযোগমত রেশমী খামটি তাঁবুর সম্মুখে ফেলে একস্থানে লুকিয়ে থাকার জন্য তাকে বলা হল। পত্রবাহক নির্দেশ মুতাবিক কার্য সম্পাদন করল। পত্রটি দূতের গোচরীভূত হওয়ার পর তিনি তা কুড়িয়ে নিয়ে দেওর নিকট প্রেরণ করলেন। পত্র পাঠ করে ভীতসন্ত্রস্ত মালদেও বিনা যুদ্ধে পলায়ন করলেন। পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ নিলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না। জয় চান্দেল, গোহা এবং আরও কতিপয় সর্দার আফগান বাহিনীকে আক্রমণ করে অমিত পরাক্রম প্রদর্শন করে। আফগান বাহিনীর একাংশ তাদের হাতে নিহত হওয়ার পর কতিপয় সৈন্য এসে স্থানীয় ভাষায় শেরশাহকে বলল 'অশ্বে আরোহণ করুন। বিধর্মীদের হাতে আপনার সৈন্যরা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে।' শেরশাহ তখন ফজরের নামায সমাধা করে সূ'রা পাঠ

৭—

করছিলেন। তিনি সৈনিকদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ইশারায় অশ্ব সজ্জিত করার আদেশ দিলেন। এমন সময় সংবাদ এল যে, কাওয়াস খান জয়া এবং গোহাকে সদলবলে নিহত করে বিজয় লাভ করেছেন। জয়া এবং গোহার বীরত্বের কথা শুনে শেরশাহ বললেন, "আমি একটি বজরার দানার কাছে দিল্লীর সিংহাসন প্রায় হারাতে বসেছিলাম।" কাওয়াস খান যোধপুর দুর্গের নিকটে নিজের নামানুসারে কাওয়াসপুর নামক একটি নগরের পত্তন করেন। কালক্রমে তিনি নাগর, আজমীর, যোধপুর ও মালওয়ার অর্থাৎ সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। মালদেও গুজরাট সীমান্তের সিওয়ানা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শেরশাহের আমীরগণ এসে বললেন যে, বর্ষাকাল সমাগত। সুতরাং সেনানিবাসে ফিরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। শেরশাহ উত্তর দিলেন, 'এমন স্থানে বর্ষাকাল যাপন করব যেখানে আমি কাজ চালিয়ে যেতে পারব। তিনি চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেরশাহ বার ক্রোশ দূরত্বে থাকতেই চিতোরের শাসক তাঁর কাছে নগরীর চাবি পাঠিয়ে দিলেন। চিতোরে পৌঁছার পর তিনি কাওয়াস খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিয়া আহমদ শিরওয়ানী ও হোসাইন খান খিলজীকে দুর্গের শাসনভার প্রদান করে কাচওয়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন। পুত্র আদিল খান রণথম্বোর ভ্রমণের জন্য তাঁর নিকট ছুটি প্রার্থনা করেন। শেরশাহ বললেন, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি প্রার্থীত ছুটি মঞ্জুর করলাম। কিন্তু ঐ দুর্গে দীর্ঘদিন কালক্ষেপণ না করে শীঘ্রই ফিরে এসো।' শেরশাহ কাচওয়ারার নিকটে এসে পৌঁছলেন। সুজাত খান হিন্দিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সুজাত খানের উপর ঈর্ষান্বিত কতিপয় ব্যক্তি বলাবলি করতে লাগল যে, ১২,০০০ সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ থাকা সত্ত্বেও সুজাত খান প্রয়োজনীয় সৈন্যদল গঠন করেননি। এজন্যই তিনি শেরশাহের সম্মুখে না এসে ছল করে হিন্দিয়া গমন করেছেন। সুজাত খানের পুত্র মিয়া বায়জিদ এবং দৌলত খান শের খানের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে পত্র লিখলেন। সংবাদ পেয়ে সুজাত খান শেরশাহের নিকট আগমন করলেন। তিনি শেরশাহকে অশ্বসমূহ চিহ্নিত করার অনুরোধ জানান। ৭৫০০ অশ্ব চিহ্নিত করা হল। বাকী অশ্বসমূহ বিভিন্ন জেলায় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাপৃত ছিল। উক্ত অশ্বসমূহও চিহ্নিত করণের জন্য শেরশাহের নিকট পাঠাবার অনুমতি চাওয়া হয়। শেরশাহ উত্তর দিলেন, 'বিভিন্ন

জেলায় অবস্থিত অশ্বসমূহকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। কেননা আপনার বাহিনী আপনার সঙ্গেই রয়েছে। যারা আপনাকে অপদস্থ করতে চেয়েছে তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে।' সুজাত খানকে বিদায় দানের সময় শেরশাহ বললেন, 'কালিঞ্জর পতনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি অবশ্যই ক্ষিপ্র-গতিতে দাক্ষিণাত্য রওয়ানা হবেন। এ ব্যাপারে মোটেই বিলম্ব করবেন না।

শেরশাহ কাচওয়া থেকে কালিঞ্জরের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। শাহবন্দি পৌঁছার পর তিনি খবর পেলেন যে, আলম খান মিয়ানা দোয়াবে গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন। মীরাট দখল করে তিনি পার্শ্ববর্তী বিরাট এলাকায় লুণ্ঠনকার্য চালিয়েছেন। শের খান এ খবর পেয়ে শাহবন্দি থেকে ফিরে বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে কিছুদূর অগ্রসর হলেন। এ সময় খবর পাওয়া গেল যে, আলম খানের পতন ঘটেছে। কাওয়াস খানের ভৃত্য ও সিরহিন্দের সুবাদার ভগবন্তের হাতে আলম নিহত হয়েছেন। শেরশাহ কালিঞ্জরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কালিঞ্জরের রাজা কিরাত সিংহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলেন না। সুতরাং তিনি দুর্গ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। দুর্গের পাশে এমন এক টিবি তৈরী করা হল, যা উচ্চতায় দুর্গ প্রাচীরকেও ছাড়িয়ে গেল। আফগান বীরবৃন্দ টিবির উপর দাঁড়িয়ে রাস্তার চলাচলকারী ও গৃহের বাইরের লোকজনকে তীরের সাহায্যে হত্যা করতে থাকেন। এরূপ বিরক্তিকর প্রণালীতে দুর্গ অধিকারের কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

রাজা কিরাত সিংহের অন্তঃপুরে একজন নর্তকী ছিল। এ রমণীর সৌন্দর্যের খ্যাতি শের খানের কর্ণগোচর হয়। উক্ত নর্তকীকে পাওয়ার জন্য শের খানের মনে প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হয়। কিন্তু তাঁর মনে আশঙ্কা হল যে, দুর্গ আক্রমণ করলে কিরাত সিংহে নিশ্চয়ই মেয়েটিকে বিষ প্রয়োগে অথবা অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করবেন। এ আশঙ্কায় তিনি উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

৯৫২ হিজরীর ৯ই রবিউল আউয়াল শুক্রবারের দু'ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর শেরশাহ আলেম-ওলামা সমভিব্যাহারে প্রাতঃরাশ গ্রহণের আয়োজন করলেন। আলেমদের ছাড়া তিনি কখনও প্রাতঃরাশ গ্রহণ করতেন না। আহারের প্রাক্কালে শেখ নিযাম বললেন,—'বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যিহাদ করার মত পুণ্য আর কিছুতেই নেই। আপনি যদি নিহত হন তাহলে শহীদী দরজা লাভ করবেন। যদি বেঁচে থাকেন তাহলে গাযীর মর্যাদা লাভ করবেন।' প্রাতঃরাশ গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর শেরশাহ তীর আনয়ন

করার নির্দেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং ঢিবির শীর্ষে আরোহণ করে নিজ হস্তে বহু তীর নিক্ষেপ করে বললেন,—'দরিয়া খান এখনও আসছেন না। তিনি অত্যন্ত বিলম্ব করেছেন!' অবশেষে শের খান জাঙ্গালের পাদদেশে অবস্থানরত সৈনিকদের নিকট নেমে এলেন। সৈনিকরা তখন দুর্গের দিকে কামান দাগাচ্ছিল। বারুদ ভর্তি একটি গোলার আঘাতে দুর্গ ফটক ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় গোলাটি ওখান থেকে ছিটকে এসে এমন একটি স্থানে পতিত হল যেখানে আরও বহু সংখ্যক বিস্ফোরক অস্ত্র রক্ষিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বারুদ ভর্তি গোলাসমূহ প্রচণ্ডবেগে বিস্ফোরিত হল। শেখ খলীল, শেখ নিযাম, অন্যান্য আলেম এবং আরও বহুসংখ্যক লোক পালিয়ে বারুদের অগ্নি হতে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হন। কিন্তু শেরশাহ আগ্নেয়াস্ত্রের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেলেন না। তাঁকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় বের করে আনা হল। গোলার পার্শে দণ্ডায়মান এক রাজকুমার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল। শের শাহকে শিবিরে আনয়ন করা হলে তিনি দরবারের আয়োজন করলেন। ঈসা খান হাজিব, মসনদ খান খালকাপুর, ঈসা খানের শ্যালক এবং গ্রন্থকারের চাচাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর জীবিত অবস্থাতেই কালিঞ্জর দুর্গ দখল করে নেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। ঈসা খান তাঁবু থেকে বহির্গত হয়ে সৈনিকদেরকে শের খানের আদেশ জানিয়ে দিলেন। আফগান বীরবৃন্দ পঙ্গপালের মত চতুর্দিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করল। জোহর নামাযের সময়ের মধ্যেই তারা দুর্গ দখল করে নিল। তরবারির আঘাতে প্রতিটি বিধর্মীকে নরকের দ্বারে প্রেরণ করা হয়। মাগরিবের নামাযের সময় বিজয় সংবাদ শের খানের কর্ণগোচর হয়। আনন্দের দীপ্ততায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রাজা কিরাত সিংহ মাত্র সত্তরজন অনুচরসহ গৃহে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। যদি তিনি পালিয়ে যান এ আশঙ্কায় কুতুব খান নিজে সারা রাত পাহারা দিলেন। শেরশাহ তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন যে, কিরাত সিংহের গৃহ পাহারা দেয়ার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ দিনের এ পরিশ্রম ও তিতিক্ষা বৃথা গেছে। অবশ্য পরদিন সূর্যোদয়ের সময় কিরাত সিংহকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনা হয়।

৯৫২ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল (মে, ১৫৪৫ খৃঃ) শেরশাহ এই বিশ্বের পান্থশালা ছেড়ে চিরস্থায়ী আনন্দ নিকেতনে প্রস্থান করেন। তিনি মহা-শান্তিতে পার্থিব নিবাস ত্যাগ করে অক্ষয় স্বর্গীয় সোপানে আরোহণ করলেন।

'আজ মরদে আরশ' শব্দগুলো দ্বারা শেরশাহের মৃত্যু সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

উপসংহার

যে সকল কার্যক্রম বাস্তবে রূপায়িত করার মানসে শেরশাহ নিজেকে এবং তাঁর পুত্র ও আমীর-ওমরাহদের পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন তার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

শেরেশাহ যখন হিন্দুস্থানের ক্ষমতা ও রাজত্ব অধিকার করলেন, তখন রাজ্যের সমৃদ্ধি, রাজপথের নিরাপত্তা, অপরাধ দমন, সুশৃংখল প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসায়ী ও সৈন্য বাহিনীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলো বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। স্বউদ্ভাবিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের পরামর্শে প্রণীত এ বিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগে তিনি বিশেষভাবে যত্নবান হন। আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের ফলে দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে প্রশান্তি ও সুস্থিরতা নেমে এসেছিল। শেরশাহ প্রায়ই বলতেন—"শাসকদের উচিত ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা। তাতে ধর্মের প্রতি প্রজা ও সরকারী আমলাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। কেননা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিটি কাজে শাসককে অংশগ্রহণ করতে হয়। অপরাধ এবং গোলযোগ রাজ্যের সমৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর শাসক-দেরকে প্রভুত্ব দান করেছেন। এজন্য শাসকদের উচিত তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকা। কোন অবস্থাতেই মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা শাসকদের উচিত নয়।"

শেরশাহ প্রশাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত ছোট-বড় প্রতিটি কাজই ব্যক্তিগত-ভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। পার্থিব কাজের ভিড়ে তিনি কখনো ধর্মীয় কাজকে তলিয়ে যেতে দেননি। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয় বিধ কাজেই তিনি সমভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। রাতের ত্রিযাম অতিবাহিত

হওয়ার পর তিনি শয্যাত্যাগ করতেন। স্নানক্রিয়াদি সমাপন করে তিনি চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তৎপর তিনি অফিসার ও মন্ত্রীদের নিকট হতে হিসাব-নিকাশ ও শাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি শ্রবণ করতেন। রাজকর্মচারিগণ সম্রাটের নিকট হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। এসকল নির্দেশ তারা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। প্রভাত হওয়ার পর তিনি পুনরায় ওযূ করে বিরাট জামাআত সহকারে ফরয নামায আদায় করতেন। সেই সঙ্গে 'মুশতা আবি আশার' পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন। এ সময় সেনাধ্যক্ষ ও আমীর-ওমরাহগণ সম্রাটকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য একে একে আগমন করতেন। তখন নকীব উচ্চৈঃস্বরে হেঁকে বলতেন,---'অমুকের পুত্র অমুক জাহাপনাকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য এসেছেন।' সূর্যোদয়ের একঘন্টা পর তিনি 'নামাযে-ইশরাক' আদায় করতেন। তৎপর জায়গীরহীন কোন সৈনিক রয়েছে কিনা জানতে চাইতেন। এরূপ কেউ থাকলে তাকে তিনি কোন অভিযানে সংযুক্ত হওয়ার আগেই জায়গীর প্রদান করতেন। কিন্তু অভিযান চলাকালে কেউ জায়গীর প্রার্থনা করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করতেন। এরপর কেউ অত্যাচারিত কিংবা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিনা তা জানতে চাইতেন এবং প্রজাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করে তার প্রতিকার ও সুবিচারের ব্যবস্থা করতেন। শেরশাহ 'সুবিচারের হীরক' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন,—'সমস্ত ধর্মীয় কাজের মধ্যে সুবিচার শীর্ষস্থানীয়। বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকল শাসকই সুবিচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।'

সর্বদা তিনি শাসন সংক্রান্ত কাজে ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। দিন এবং রাতকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী তিনি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতেন। এ কাজে তিনি কোনরূপ গাফিলতি কিংবা অলসতা বরদাশত করতেন না। তিনি বলতেন,—'যারা মহৎ তাদের সর্বদা কর্মঠ থাকতে হবে। উচ্চাসনের গর্বে স্ফীত হয়ে শাসন সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কাজকেও তাদের অবহেলা করা উচিত নয়। উজীরদের উপর অহেতুক বিশ্বাস কিংবা ভরসা করে থাকাও শাসকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। সমসাময়িক শাসকদের মন্ত্রীগণের নৈতিক অবনতির সুযোগেই আমি সাম্রাজ্য দখল করতে সমর্থ হয়েছি। উজীরদের নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে এমন কোন কাজের সুযোগ দেয়া শাসকদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। কেননা ঘুষ

গ্রহণকারীরা ঘুষদাতার উপর নির্ভরশীল। পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি উজীর হওয়ার অনুপযোগী। কারণ এরূপ ব্যক্তিরা স্বার্থপর হয়ে থাকে। একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রতি সকল আনুগত্য ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।' শেরশাহের নিকট কোন অত্যাচারের অভিযোগ এলে তিনি সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিতেন এবং সুবিচারের বন্দোবস্ত করতেন। পুত্র, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী কিংবা নিকটতম আত্মীয় হলেও তিনি অত্যাচারী ব্যক্তিকে রেহাই দিতেন না। অত্যাচারীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে তিনি কোন গাফিলতি কিংবা বিলম্ব করতেন না। শেরশাহ যে সকল আইন প্রবর্তন করেছেন তন্মধ্যে অশ্বচিহ্নিতকরণ অন্যতম। শেরশাহের পূর্বে এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে অন্য কোথাও প্রচলিত ছিল না। দলপতি ও সাধারণ সৈনিকের অধিকারের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। তাতে সেনাধ্যক্ষগণ সৈনিকদেরকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হত না। ফলে প্রত্যেকে পদমর্যাদা অনুসারে সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং সৈন্য সংখ্যার তারতম্য ঘটানোর পথও রুদ্ধ হয়ে যেত। শেরশাহ বলেছেন, 'সুলতান ইবরাহীম ও তাঁর পরবর্তী সময়ের আমীর-ওমরাহের জালিয়াতি ও মিথ্যাচারপূর্ণ কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। যখন তাঁদের মাসিক বেতন দেয়া হত তখন তারা অধিক সংখ্যক সৈন্য পোষণ করতেন। কিন্তু জায়গীর লাভ করার পর তাঁরা বিনা বেতনে বিপুলসংখ্যক সৈন্যকে ছাঁটাই করে দিতেন। অত্যাবশ্যকীয় কার্য সমাধার জন্য শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য রাখতেন। অধিকন্তু এ সকল সৈন্যকেও তারা পূর্ণ বেতন দিতেন না। প্রভুর স্বার্থের দিকে তারা মোটেই নজর দিতেন না। নিজেদের অকৃতজ্ঞতার জন্য তাদের কোন অনুশোচনাও ছিল না। শাসক যখন সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতে চাইতেন, তখন তারা অপরিচিত লোক ও নতুন অশ্ব এনে হাজির করতেন। এভাবে তারা রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করতেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় সৈন্যের অভাব দেখা দিত। প্রভুর বিপদকালে আমীরগণ আত্মসাৎকৃত অর্থের দ্বারা নিজেদের হস্তকে শক্তিশালী করে বিপক্ষ দলে যোগদান করতেন। এভাবে তার প্রভুর অর্থে প্রভুরই ধ্বংসসাধনে লিপ্ত হতেন। কিন্তু এ ধ্বংস সাধনের ফলশ্রুতি হিসেবে নিজেদেরও কম দুর্ভোগ পোহাতে হত না। ক্ষমতালাভের সৌভাগ্য যখন আমার হয়েছে, তখন সৈনিক ও আমীরদের এ প্রতারণা রোধ করার জন্য আমি অশ্ব চিহ্নিতকরণের রীতি প্রচলন করেছি। ফলে তারা

সৈন্যবাহিনীতে ঘাটতি পুরণের জন্য ভুয়া ও নবাগত এবং সৈন্যের আমদানী করতে পারবে না।' অশ্বচিহ্নিত না করলে শেরশাহ কোন সৈন্যকে এক কপর্দকও বেতন দিতেন না। এমনকি চিহ্নিতকরণ ছাড়া রাজ প্রাসাদের ঝাড়ুদার এবং চাকরাণীদেরকেও বেতন দেয়া হত না। সৈন্য কিংবা অশ্বের বর্ণনামূলক বিবরণী লিখে প্রত্যেকের জন্য একটি নামার নির্দিষ্ট করে তাকে শেরশাহের সম্মুখে আনয়ন করা হত। তিনি স্বয়ং নামার পরখ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বেতন নির্ধারিত করতেন। তৎপর তার সম্মুখেই উক্ত ব্যক্তি অশ্বকে চিহ্নিত করত। নামায-ই-ইশরাক সমাপ্ত করার পর তিনি বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। প্রতিটি লোককে আলাদা বেতন দান, পুরাতন সৈন্যবাহিনীর পরিদর্শন, নবনিযুক্ত সৈন্যকে উপদেশ দান ও আফগানদেরকে মাতৃভাষায় প্রশ্নকরণ ইত্যাদি কাজ একটির পর একটি করে সমাধা করতেন। কেউ আফগান ভাষায় তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হলে তিনি তাকে বলতেন—'ধনুকটি টান'। সে ব্যক্তি ধনুকের ছিল আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে শেরশাহ তাকে অধিকতর বেতন দান করে বলতেন—আফগান ভাষাভাষী লোককে আমি বন্ধু হিসেবেই গণ্য করি।' উক্ত স্থানেই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে আনীত ধনসম্পদ পরিদর্শন করতেন। তাছাড়া পদস্থ কর্মচারী, জমিদার, উকিল, বিদেশী রাজদূতের সাথে পর্যায়ক্রমে সাক্ষাৎ দান করতেন। তৎপর আমীর-ওমরাহদের নিকট হতে বিভিন্ন তথ্যাদি অবহিত হয়ে তৎসম্পর্কে নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে মতামত প্রকাশ করতেন। মুনশীরা তার মতামত ও নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে রাখত। এভাবে আড়াই ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আলেম-ওলেমা সহযোগে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করতেন। প্রাতঃরাশ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স্বীয় পূর্বোল্লিখিত রুটিন মাফিক দুপুর অবধি শাসনকার্যে ব্যস্ত থাকতেন। মধ্যাহ্নে ইবাদত এবং স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অবসর বিনোদন করতেন। বিশ্রাম গ্রহণের পর বিরাট জামাত সহযোগে আসর নামায আদায় করতেন। এর পর তিনি পবিত্র কুরআন পাঠরত হতেন। তৎপর পুর্বোল্লিখিত সূচী মোতাবেক প্রশাসনকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। স্বদেশ কিংবা বিদেশে কোথাও তিনি এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দিতেন না।

রাজস্ব আদায় ও রাজ্যের সমৃদ্ধি বিধানকল্পে শেরশাহ নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রনয়ণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ঃ

প্রতিটি পরগণায় একজন আমীর, একজন ধর্মভীরু শিকদার, একজন কোষাধ্যক্ষ, দুজন কারকুন (একজন হিন্দী ও অপর জন ফারসী লিখতে সক্ষম) নিয়োগ করা হত। প্রতিবার ফসল তোলার সময় ভূমি পরিমাপ করার জন্য গভর্নরকে নির্দেশ দেয়া হত। জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের অনুপাত অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। উৎপাদনের একভাগ কৃষক, অর্ধভাগ মুকাদ্দামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফসলের রকম অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। কৃষকরাই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির উৎস। সুতরাং তারা যাতে মুকাদ্দাম, চৌধুরী ও আমীলদের হাতে উৎপীড়িত না হন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। শেরশাহের রাজত্বের পূর্বে ভূমি জরিপের প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক পরগনায় একজন কানুনগো নিয়োগ করা হত। এদের সাহায্যেই পরগনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা ও আয়তন নির্ধারণ করা হত। কিন্তু আমীল ও জনসাধারণ উভয়ের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার জন্য শেরশাহ প্রতিটি সরকারে একজন প্রধান শিকদার, একজন প্রধান মুন্সেফ নিয়োগ করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমিলগণ জনসাধারণের উপর অহেতুক অত্যাচার কিংবা রাজস্বের অর্থ আত্মসাৎ করতে সক্ষম হতেন না। পরগনার সীমারেখা নিয়ে আমিলদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে প্রধান শিকদার ও প্রধান মুন্সেফ তা মীমাংসা করতেন। ফলে প্রশাসন কার্যে সকল বিরোধ ও সন্দেহের নিরসন ঘটত। কেউ যদি বিদ্রোহ কিংবা আইন-শৃঙ্খলা ভংগের মনোভাব নিয়ে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে গোলযোগের সৃষ্টি করত তাহলে তাকে কঠোর সাজা দেয়া হত। ফলে অন্যরা অনুরূপ দুঃসাহস প্রদর্শনের প্রয়াসী হত না।

প্রতি এক বছর কিংবা দুবছর পর তিনি পুরাতন আমীলকে, বদলী করে তদস্থলে নতুন আমীল নিয়োগ করতেন। তিনি বলতেন—আমি সর্বপ্রকারে পরীক্ষা চালিয়ে এ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জেলার প্রশাসনে যে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় অন্য কোন চাকরিতে তা নেই। সুতরাং অন্যের বদলে আমি আমার পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারীকেই জেলার শাসনভার দিয়ে থাকি যাতে তারাই উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। দুই বছর পর তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে অনুরূপ বিশ্বস্ত কর্মচারীকে জেলায় বদলী করে পাঠাই। ফলে তারাও নিজের ভাগ্যকে গড়ে নিতে সক্ষম হয়। পুরাতন কর্মচারীদেরকে নানা সুযোগ-সুবিধা দানের

মাধ্যমে তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের তোরণ খুলে দেয়াই হল আমার উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য।'

এভাবে গঠিত সৈন্যবাহিনী ও সঞ্চিত সম্পদ প্রতি বছর শেরশাহের নিকট পাঠানো হত। তাঁর সৈন্য সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। বরং তা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।

রাজ্য রক্ষা, অবাধ্য জমিদারদের শায়েস্তা, নানাবিধ বিদ্রোহ দমনকল্পে এরূপ কঠোর ও সুসংহত সামরিক আইন প্রনয়ণ করা হয়েছিল যে, সাম্রাজ্যকে কেউ অরক্ষিত বলে ভাবতে পারত না। সুতরাং কেউ সাম্রাজ্য দখল কিংবা আক্রমণের সাহসী হত না। শেরশাহের প্রণীত সামরিক নীতিমালা নিম্নে বিবৃত হল ঃ

'শেরশাহ সর্বদা দেড়লক্ষ অশ্বারোহী ও পঁচিশ সহস্র পদাতিক পোষণ করতেন। বারুদের বন্দুক অথবা ধনুকই ছিল প্রধান অস্ত্র। কোন কোন অভিযানে তিনি উপরোক্ত সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে রেখেছেন। আজীম হুমায়ুন উপাধিপ্রাপ্ত হায়বত খান নিয়াজী রোহতাস দুর্গের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিরিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈনা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। উক্ত বাহিনীর দ্বারা কাশ্মিরী ও গাক্কারদের দমন করতেন। দীপাল পুর ও মুলতানের শাসনভার ফতেহ জং খানের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মুলতানের রাজকোষে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদের পাহাড় জমে উঠেছিল। মিওয়াট দুর্গের (ইহা তাতার খান ইউসুফ খাইল কর্তৃক সুলতান বাহলুলের আমলে নির্মিত হয়) শাসনভার দেয়া হয়েছিল হামিদ খান কাকারের হাতে। তিনি নগরকোট, জোয়ালী, দিদাওয়াল ও জম্মু পর্বতমালা অর্থাৎ বস্তুতপক্ষে সমগ্র পর্বত এলাকা এরূপ কঠোরভাবে শাসন করেছেন যে, কেউ তার বিরুদ্ধে টু-শব্দ করতে সাহসী হয়নি। তিনি পাহাড়ী প্রজাবৃন্দের নিকট হতে ভূমির পরিমাপ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করতেন। মসনদ-ই-আলা কাওয়াস খানের হাতে সরহিন্দের জায়গীরদারী দেয়া হয়। তিনি তাঁর ক্রীতদাস মালিক ভগবন্তকে উহার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন। মিয়া আহমদ খান শিরওয়ানী ছিলেন রাজধানী দিল্লীর আমীর। আদিল খান ও হাতেম খান ছিলেন যথাক্রমে শিকদার ও ফৌজদার। নাসির খানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাষলের সর্দার ও কৃষককুল দেশত্যাগ করে পালিয়েছিল। শেরশাহ তথায় মসনদ-ই-আলা হায়বত খান কালকাপুরের পুত্র মসনদ-ই-আলা ঈসা খানকে প্রেরণ করলেন। ঈসা খান খান-ই-আজম উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একসময় সুলতান বাহলুল ও সিকান্দারের পরিষদ ও পরামর্শদাতার অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। শেরশাহ তাঁকে বললেন, 'আপনার পরিবারবর্গ ও পুরাতন অশ্বারোহীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি আপনাকে কান্ট, গোলা এবং টিলহার পরগনাসমূহ দান করেছি। চাম্বলের জন্য পাঁচ সহস্র নতুন অশ্বারোহী সংগ্রহ করুন। কেননা তথাকার জনসাধারণ ও কৃষককুল দাঙ্গাবাজ এবং বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। তারা সর্বদা শাসকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে।'

মসনদ-ই-আলা ছিলেন শক্তি ও বীরত্বে সিংহ সমতুল্য। তিনি চাম্বলের শাসনভার গ্রহণ করে এরূপ কঠোরতার পরিচয় দিলেন যে, তথাকার জমিদারগণ অপত্য স্নেহে রক্ষিত জঙ্গলসমূহ নিজ হাতে কর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য একাজ করতে গিয়ে তারা বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল। ঈসা খানের তরবারির ভয়ে তারা পরিবর্তিত ও অনুতপ্ত হয়ে ডাকাতি ও লুঠতরাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভূমির পরিমাপ অনুযায়ী তারা রাজস্ব আদায় করত। শেরশাহ বলেছিলেন,—'ঈসা খান ও মিয়া আহমদের শাসনের ফলে আমি দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সকল দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি।'

কনৌজের শিকদার বাইরাক নিয়াজীর কঠোর শাসনের ফলে সমগ্র দেশের লুঠতরাজ ও বিদ্রোহ বিদূরিত হয়ে যায়। নিজের ক্ষমতাকে তিনি এতদূর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, কনৌজের কোন লোক গৃহে একটি তরবারি, একটি তীর, একটি ধনুক, এমনকি লৌহ নির্মিত কোন বস্তু রাখতেও সাহসী হত না। গৃহস্থালী ও রান্না-বান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্র জাতীয় অন্যকোন বস্তু তাদের ঘরে পরিলক্ষিত হত না। নিয়াজী যখন কোন গ্রামের দলপতি বা সর্দারকে ডেকে পাঠাতেন, তখন তারা অবাধ্য হতে সাহসী হতেন না। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তারা শিকদারের হুকুম তামিল করত। বস্তুত তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করার মত লোক সমগ্র কনৌজে একটিও ছিল না। বিদ্রোহী ব্যক্তিদের মনে নিয়াজী এরূপ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় নির্ধারিত কর আদায় করত।

চাম্বল ও যমুনা নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে শেরশাহ সরহিন্দ সরকারের নিকট হতে বার সহস্র অশ্বারোহী এনে হাটকান্ট ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় শিবির স্থাপন করেন। উক্ত বাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কৃষক জমিদারকে ধ্বংস করা হয়।

শেরশাহ গোয়ালিয়র দুর্গে একসহস্র বন্দুকধারী সৈন্যসহ একটি বাহিনী নিয়োজিত করেছিলেন। বায়ানায় রাখা হয় ৫০০ বন্দুকধারী-সহ এক ডিভিশন সৈন্য। রণথম্বোর রক্ষার ভার দেয়া হয়েছিল অপর এক ডিভিশন সৈন্য ও ১৬০০ গোলন্দাজের হাতে। চিতোরে ছিল তিন সহস্র বন্দুকধারী। মনডু বা আদমাবাদ শাসন করতেন সুজাত খান। তাঁর অধীনে ছিল দশ সহস্র অশ্বারোহী ও সাত সহস্র বন্দুকধারী বাহিনী। সুজাত খান মালওয়া ও হিন্দিয়ার জায়গীরদারীও লাভ করেছিলেন। রাইসিনে এক সহস্র গোলন্দাজসহ একটি বাহিনী রাখা হয়। চুনার দুর্গে রাখা হয়েছিল এক সহস্র গোলন্দাজ ও অপর একটি বাহিনী। বিহারের নিকটস্থ রোহতাস দুর্গের অধিনায়কত্ব দেয়া হয় ইখতিয়ার খান পন্নীর হাতে। তাঁর অধীনে ছিল এক সহস্র সৈন্যের গোলন্দাজ বাহিনী। শেরশাহ উক্ত দুর্গে বেশুমার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। ভাদুরিয়া রাজ্যেও তিনি একদল সৈন্য পোষণ করতেন। কাওয়াস খান এবং ঈসা খানের অধীনে যোধপুর ও আজমীরে দুটি পৃথক সৈন্যদল রক্ষিত ছিল। বাংলাকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে কাজী ফজিলতকে সমগ্র দেশের আমীর নিযুক্ত করা হয়। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য যেখানে প্রয়োজন পড়ত, সেখানেই শেরশাহ সৈন্য বাহিনী পোষণ করতেন।

কিছুদিন পর পর তিনি অলস ও আরামপ্রিয় সেনাধ্যক্ষকে জায়গীর থেকে বদলী করে তদস্থলে কর্মঠ ও পরিশ্রমী সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করতেন। বিচার কার্যের সুবিধার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বদা জনহিতৈষী কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। জনসাধারণ এ বদান্যতার সুফল তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালেও ভোগ করতে পেরেছিল। তাঁর অমর আত্মার উপর গৌরব ও আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। দরিদ্র পথচারীর সুবিধার্থে তিনি রাজপথের ধারে ধারে (দুই ক্রোশ পর পর) সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এরূপ একটি রাস্তা পাঞ্জাব থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগ্রা থেকে বোরহানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অপর একটি রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। বোরহানপুর দাক্ষিণাত্যের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। আগ্রা হতে যোধপুর ও চিতোর অবধি আর একটি রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটিও তিনি নির্মাণ করেন। এ সকল রাস্তায় মোট ১৭০০ সরাইখানা বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি সরাই খানায় হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থা ছিল। ফটকের

সম্মুখে সুপেয় জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল। এ জলে পথিকেরা জলতৃষ্ণা নিবারণ করত। সকল শ্রেণীর লোক পুষ্করিণীর জল পান করার অধিকারী ছিল। হিন্দু পথচারীকে জল সরবরাহ, খাদ্য বিতরণ, তাদের অশ্বের আহার্য প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিটি সরাই খানায় ব্রাহ্মণ কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। যে কেউ সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, পদমর্যাদা অনুসারে তার জন্য এবং তার বাহকের জন্য সরকারী খরচে উপযুক্তভাবে থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করা হত এবং এই-ই ছিল সরাইখানার প্রচলিত নিয়ম। সরাইখানার মধ্যস্থলে একটি কুয়া ও ইষ্টক নির্মিত একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক মসজিদের জন্য তিনি একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছিলেন। সরাইখানার জন্য রক্ষক এবং পাহারাদারও নিযুক্ত করা হয়েছিল। সরাইখানার পার্শ্ববর্তী জমির উৎপাদন থেকেই যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হত। দ্রুত খবরাখবর বহন করার জন্য প্রতিটি সরাইখানায় দু'টি করে অশ্ব রাখা হত। আমি (গ্রন্থকার) শুনেছি যে, একবার হুসাইন তত্তদার একটি জরুরী সংবাদ নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে তিনশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে তিনি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। গ্রীষ্মের দিনে পথিকগণ বৃক্ষছায়ায় ক্লান্তি নিবারণ করত। কোথাও যাত্রা স্থগিত রাখার প্রয়োজন হলে তারা বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করত। কিংবা নিজেরা সরাইখানায় আশ্রয় নিয়ে এ সকল বৃক্ষের সাথে অশ্ব বেঁধে রাখত।

শেরশাহ রোহতাস নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বলনাথ যোগী পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইহা অবস্থিত। বেহাত নদী ও লাহোর থেকে এ দুর্গের দূরত্ব ছিল যথাক্রমে চার ক্রোশ ও ষাট ক্রোশ। কাশ্মীরী ও গাক্কারদের দমিত রাখাই ছিল এ দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য। শেরশাহ রোহতাসকে অত্যধিক শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করেছিলেন। এরূপ শক্তিশালী দুর্গ তখনকার দিনে আর একটিও ছিল না। রোহতাস দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। আমি (গ্রন্থকার) শেরশাহের ইতিহাস বর্ণনাকারীর নিকট শুনেছি যে, দুর্গ নির্মাণের প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় পাথর সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৌশলীগণ পাথরের এ দুষ্প্রাপ্যতার কথা শেরশাহের গোচরীভূত করেন। তাঁরা আরও জানালেন যে, পাথর পাওয়া গেলেও তা বিপুল চড়া দামে সংগ্রহ করতে হবে। শেরশাহ এ

কথার উত্তরে জানালেন যে, 'সম্পদ ব্যয়ের ভয়ে তাঁর কোন আদেশ বা পরিকল্পনাকেই ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না!' প্রয়োজন হলে সমপরিমাণ তামার বিনিময়ে পাথর সংগ্রহ করে দুর্গ নির্মাণ করার আদেশ দেয়া হয়। শেরশাহ এই দুর্গকে ক্ষুদ্র 'রোহতাস' বলে অভিহিত করতেন।

প্রাক্তন রাজধানী শহর দিল্লী যমুনা নদী হতে দূরে অবস্থিত ছিল। শেরশাহ উহা ধ্বংস করে যমুনার তীরে এ শহর পুনঃনির্মাণ করেন। তথায় পর্বতের চাইতে শক্তিশালী উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি দুর্গ নির্মাণের জন্য তিনি আদেশ দিলেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর দুর্গটি নির্মিত হয় গভর্নরের জন্য। অপরটির প্রাচীর সমগ্র শহর অবধি পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার দ্বারা রাজধানী শহরের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। গভর্নরের দুর্গে প্রস্তরঘটিত একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদের কারুকার্যে বিপুল স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বের যাবতীয় নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার পূর্বেই শেরশাহ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শাসারামে একটি অতীব মনোরম সমাধি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। উহা অদ্যাবধি দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বিরাজ করছে। কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। খণ্ডিত পাথর প্রাচীরের মুখোমুখি করে ইহা নির্মিত হয়েছিল।

ভারতীয় নৃপতিদের প্রাক্তন রাজধানী কনৌজে তিনি দগ্ধ ইট দিয়ে একটি দুর্গ তৈরী করেন। যে স্থানে তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন—সেখানে একটি শহর নির্মাণ করেন—এই শহরের নাম রাখা হয় 'সেরসুর'। পুরানো শহরের ধ্বংস সাধনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাইনি এবং এ কাজটি ছিল জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর। বহন কুণ্ডলে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত স্থানের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি আরও একটি দুর্গ তৈরী করেন। এ দুর্গের নামকরণ করা হয় 'শের কোহ'। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অধিককাল বেঁচে থাকলে সাম্রাজ্যের প্রতিটি রাজ্যের উপযুক্ত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করব। বিদ্রোহের সময় উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বিদ্রোহ দমনের কাজেও ইহা অত্যধিক সহায়ক হবে। আমি সরাইখানাগুলো ইটের দ্বারা নির্মাণ করছি। ফলে পথচারীদের রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান সহজতর হয়ে উঠবে।'

চোর-ডাকাতের হাত থেকে পথিকদের রক্ষা করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ঃ

আমিরও গভর্নরদের উপর এইমর্মে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাদের এলাকায় যদি কোন চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হয় এবং দুষ্কৃতিকারীর অনুসন্ধান পাওয়া না যায় তাহলে উক্ত এলাকার চতুর্দিকস্থ মুকাদ্দামগণকে (গ্রামপতি) গ্রেফতার করা হবে। এ ব্যাপারে মুকাদ্দামকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হত। কিন্তু তারা যদি দুষ্কৃতিকারীদের হাজির করতে পারত কিংবা তাদের আস্তানার অনুসন্ধান দিতে সক্ষম হত তাহলে দুষ্কৃতিকারীরা যে এলাকার আশ্রিত সে এলাকার মুকাদ্দামকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হত। এ ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মোকাদ্দামের হাতে ন্যস্ত করা হত। ডাকাতদের কুরআনী আইন মুতাবিক শাস্তি প্রদান করা হত। কোথাও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে এবং হত্যাকারীর অনুসন্ধান দিতে না পারলে, আমীররা পূর্বোল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী মোকাদ্দামকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন। আসামীর নাম ঘোষণার জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হত। হত্যাকারীকে হাজির করলে কিংবা তাদের অনুসন্ধান দিতে পারলে মুকাদ্দামকে মুক্তি দেয়া হত এবং হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত। কিন্তু হত্যাকারীর অনুসন্ধান দিতে অক্ষম হলে উক্ত এলাকার মোকাদ্দামকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। কারণ সাধারণত দেখা যেত যে, মুকাদ্দামদের পরোক্ষ সম্মতির ফলেই অনুরূপ অপরাধমূলক কার্য সংঘটিত হত। গ্রামে দু-একটা চুরি-ডাকাতি মুকাদ্দামের অজ্ঞাতসারে ঘটলেও অনু-সন্ধানের মাধ্যমে তারা অপরাধীর খোঁজ দিতে সক্ষম হত। কেননা মোকাদ্দাম ও কৃষকগণ অনেকটা চোরের মতই। উভয়ের মধ্যে একটা আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক বিরাজ করত। সুতরাং হয় তো মুকাদ্দামগণ চুরি কিম্বা ডাকাতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকত, নতুবা প্রকৃত আসামীর সঠিক তথ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হত। চোর-ডাকাত আশ্রয়দানকারী মোকাদ্দাম অবশ্যই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে অন্যদের নিকট ইহা নজীর হয়ে থাকত এবং অনুরূপ কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস প্রদর্শন করত না।

শেরশাহ ও ইসলাম শাহের আমলে মুকাদ্দামগণ অতি সতর্কতার সঙ্গে গ্রামের নিরাপত্তা বিধান করতেন। কেননা এলাকায় কোন চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হলে পরিনামে তাদেরই সর্বনাশ সাধিত হত। বণিক ও পথ-চারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য করার জন্য শেরশাহ গভর্নর ও আমীরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভ্রমণকারীদের যাতে কোনরূপ ক্ষতি সাধিত

না হয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হতো। কোন বণিক রাস্তায় মৃত্যুবরণ করলে তার দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাৎ না করার জন্য শেরশাহের কড়া নির্দেশ ছিল। কেননা শেখ নিযামী (তার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হউক) বলেছেন,—'আপনার রাজ্যে মৃত্যুবরণকারী কোন বণিকের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।' সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে শেরশাহ মাত্র দুটি স্থানে বিপণীর উপর বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করেছিলেন। প্রথমত বাংলাদেশ থেকে আগত দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হত। দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় খোরাসান হতে আগত দ্রব্যের বিপণীর উপর কর আরোপিত হয়েছিল। বাজার এলাকা সমূহেও বিক্রয় কর ধার্য করা হয়েছিল। এই দ্বিবিধ কর ব্যতীত কেহ নগর কিম্বা গ্রামের ফেরী ও রাস্তায় অন্য কোনরূপ শুল্ক আদায় করতে পারত না। শেরশাহ তাঁর কর্মচারীদেরকে স্বাভাবিক বাজার মূল্য ব্যতীত অন্যবিধ মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

শেরশাহের অপর একটি বিধি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

শস্যক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন না করার জন্য তিনি তাঁর বাহিনীর নিকট আদেশ জারি করেছিলেন। অভিযানে যাত্রা প্রাক্কালে সৈন্যরা যাতে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখতেন। অনুরূপ ক্ষতিকারক কার্য নিবারণের জন্য সৈন্যবাহিনীর দু'পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে ঘোড় সওয়ার নিযুক্ত করা হত। খান-ই-আযম মোজাফফর শাহ সর্বদা শেরশাহের নিকট অবস্থান করতেন। আমি (গ্রন্থকার) তাঁর মুখে শুনেছি, পথ চলা-কালে শেরশাহ সর্বদা ডানে এবং বামদিকে তাকাতেন। কোন সৈনিককে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন করতে দেখলে, তিনি নিজহাতে তার কান কেটে কর্তিত কর্ণ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। ঐ অবস্থায় তাকে তাঁবুর চতুর্দিকে ঘুরিয়ে আনা হত। রাস্তার সংকীর্ণতার জন্য কোন শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে বাধ্য হলে তিনি আমীরকে পাঠিয়ে ক্ষতির পরিমাণ জেনে নিতেন এবং কৃষককে উক্ত পরিমাণ শস্যের ক্ষতিপূরণ দান করতেন। বাধ্য হয়ে শস্যক্ষেত্রের নিকট শিবির স্থাপন করা হলে শস্যক্ষেত্রের যাতে কোনরূপ ক্ষতিসাধন না হয়, সৈনিকরা সেদিকে কড়া নজর রাখত। কেননা অনুরূপ ক্ষতি সাধনের পরিনামস্বরূপ শেরশাহ তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করতেন। কোন শত্রু-রাজ্যে প্রবেশ করার পর তিনি তথাকার কৃষককে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতেন না কিম্বা লুঠতরাজ চালিয়ে ফসল নষ্ট

করতেন না। তিনি বলতেন, 'কৃষককুল নির্দোষ। ক্ষমতাসীনের নিকটই তারা আত্মসমর্পণ করে। আমি যদি তাদের উপর অত্যাচার চালাই তাহলে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে, ফলে সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত হবে। দেশকে পুনরায় সমৃদ্ধশালী করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে।' শেরশাহ অনেকগুলো শত্রু রাজ্যে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুবিচারের ফলে তথাকার অধিবাসীরা কখনো দেশ ত্যাগ করত না বরং তারা সৈনিকদের জন্য রসদ সরবরাহ করত। উদারতা ও মহত্ত্বের গুণে তিনি অল্পকালের মধ্যেই বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদের মন জয় করতে সমর্থ হতেন। তিনি সৈনিকদের মধ্যে স্বর্ণ ও মেঘের বৃষ্টি ধারার মতই মনি-মানিক্য বিতরণ করতেন। এ বদান্যতার বলেই সমগ্র আফগান জাতি তাঁর পিছনে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিণামে তিনি হিন্দুস্থানের রাজত্ব লাভ করেছিলেন। কোন সৈনিক অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি তৎক্ষণাৎ তার অভাব মোচন করতেন। বেকার কিংবা দরিদ্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে তিনি তাদের অসহায়ত্ব কিংবা নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করতেন। জীবিকা প্রদানের জন্য প্রতিদিন তিনি অনুরূপ ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে রাখতেন। শেরশাহের রন্ধনশালা ছিল অত্যন্ত বিশাল। ফিয়াহী নামে অভিহিত আফগান ভাষাভাষী কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও অনুচরের আহার্য উক্ত রন্ধনশালায় প্রস্তুত করা হত। শেরশাহের আদেশ ছিল কোন সৈন্য, আলেম কিংবা কৃষক খাদ্য প্রার্থী হলে তাকে শাহী পাকশালা থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। কাউকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হত না। গরীব দুঃখীদের মধ্যে খাদ্য বন্টনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং উপরোল্লিখিত প্রথানুযায়ী সকলের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হত। এ কার্য নির্বাহের জন্য দৈনিক ৫০০ আশরফী (স্বর্ণের মোহর) ব্যয় হত।

শেরশাহ জানতেন যে, সুলতান ইব্রাহীমের আমল থেকেই মসজিদের ইমামগণ আমীলদের ঘুষ প্রদান করে বরাদ্দের অধিক ভূমি ভোগ দখল করতেন। শেরশাহ অন্যায়ভাবে গৃহীত ভূমি ফিরিয়ে নেন। যথোপযুক্ত অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত মালিকের নিকট উক্ত জমি হস্তান্তর করেন। অবশ্য কাউকে তিনি সম্পদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেন নি। অন্যায়-পন্থা অবলম্বনকারীকে রাহা-খরচ দিয়ে তিনি তাদের পদচ্যুত করেন। অন্ধ, বৃদ্ধ, বিধবা, রুগ্ন ও রোজগারে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। উক্ত বৃত্তির টাকা স্ব-স্ব বাসস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

যারা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়ে দূরদূরান্ত থেকে আগমন করত, চাহিদা মিটিয়ে তিনি তাদের রাহা-খরচ দিয়ে স্বস্থানে পাঠিয়ে দিতেন। ইমামদের প্রতারণাপূর্ণ কাজ রোধ করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ঃ বরাদ্দকৃত ভূমি বা অর্থের ফরমান তিনি সরাসরি ইমামদের নিকট পাঠাতেন না। কোন পরগনায় এরূপ ভূমি প্রদানের প্রয়োজন হলে শেরশাহ মুন্‌শীকে প্রয়োজনীয় ফরমান প্রস্তুতের নির্দেশ দিতেন। ফরমানপত্র প্রস্তুত করে আনা হলে শেরশাহ তাতে নিজ হাতে সিলমোহর দিতেন। তৎপর উহা বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে দিয়ে বলতেন—'ফরমানগুলো অমুক অমুক পরগনায় নিয়ে যাও।' শিকদারের নিকট ফরমান পৌঁছার পর তিনি প্রথমে প্রাপ্ত বৃত্তি ইমামদের নিকট বিতরণ করতেন। তারপর ফরমানসমূহ তাদের নিকট হস্তান্তর করতেন। শেরশাহ প্রায়ই বলতেন, —"ইমামদের বৃত্তিদান করা শাসকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেননা ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের উপর হিন্দুস্তানের নগরসমূহের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। শিক্ষক, পথচারী এবং অভাবগ্রস্তরা সাধারণত সম্রাটের নিকট আসার সুযোগ পায় না। সুতরাং তারা ঐ সকল বৃত্তিধারীদের দ্বারা উপকৃত হবে। তাতে পথচারী ও দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি হবে, ধর্ম-শিক্ষা প্রভৃতির প্রসার লাভ করবে। যে ব্যক্তি মহৎ হতে ইচ্ছুক তার উচিত উলামা সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতাগণকে সযত্নে পোষণ করা। এর ফলে তিনি ইহকাল ও পরকালে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী হবেন।

আফগানিস্তান থেকে কোন ধর্মভীরু আফগান শেরশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদের আশাতীত অর্থ প্রদান করে বলতেন, 'যে হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের আমি অধিকারী তারই অংশীদার হিসেবে আপনাকে এ অর্থ দেওয়া হল। এটা আপনার প্রাপ্য। প্রতি বছর এ অর্থ গ্রহণের জন্য আপনি হিন্দুস্থানে আগমন করবেন।' রোহে অবস্থানরত শূর বংশের পরিবারকে তিনি বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করতেন। পরিবারের সদস্যদের সংখ্যানুপাতিক হারে এ বৃত্তি প্রদান করা হত। শেরশাহের রাজত্বকালে রোহ কিংবা হিন্দুস্থানের কোন আফগানই অভাবগ্রস্ত ছিল না। তারা প্রত্যেকেই প্রাচুর্যের মাঝে জীবন যাপন করতেন। সুলতান বাহলুল ও সিকান্দার-এর আমল থেকে শুরু করে সমগ্র আফগান রাজত্বকাল পর্যন্ত এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, একবার কোন আফগানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ

কিংবা সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হলে তাকে প্রতি বছর উক্ত পরিমাণ অর্থ বা পোশাক বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হত।

শেরশাহের হস্তীশালায় পাঁচ হাজার হস্তী বিদ্যমান ছিল। তাঁর নিকট রক্ষিত অশ্বের কখনো সঠিক সংখ্যা নির্ণিত হয়নি। কেননা তিনি প্রচুর অশ্ব ক্রয় করতেন। আবার বেপরোয়াভাবে তা দান করে দিতেন। সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তিন হাজার চারশ' অশ্ব নিয়োজিত ছিল। হিন্দুস্থানের এক লক্ষ তের হাজার পরগনা শেরশাহের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি পরগনায় একজন শিকদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরগনাগুলোতে পরিপূর্ণ শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। কোথাও বিদ্রোহ কিংবা গোলযোগ পরিলক্ষিত হত না। সমগ্র দেশে এক অনাবিল শান্তি বিরাজ করত। খাদ্যশস্য ছিল অত্যন্ত সস্তা। শেরশাহের আমলে কোথাও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি।

তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল অগণিত। দিন দিন বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি পেত। প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য যে সকল বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তার সার্থক প্রয়োগের নিমিত্ত শেরশাহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। তারা আমীর-ওমরাহ, জনসাধারণ ও সৈন্যদের গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে সম্রাটের নিকট গোপন বার্তা প্রেরণ করত। আমীর-ওমরাহ ও উজীরগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্রাটের গোচরীভূত করতেন না। কিন্তু শেরশাহ গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে সবকিছু জেনে নিয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

আমি (গ্রন্থকার) সুজাত খানের একজন বিশ্বস্ত আফগান সহচরের নিকট নিম্নোক্ত ঘটনাটি শ্রবণ করেছি ঃ শেরশাহ সুজাত খানকে মালওয়ার শাসন-ভার অর্পণ করেন। শাসনভার হাতে নেওয়ার পর তিনি জায়গীর বিতরণের কাজ শুরু করেন। এ সময় উজীরগণ সুজাত খানকে বললেন,—'আপনার ইচ্ছানুযায়ী জায়গীর বণ্টনের ইহাই উপযুক্ত সময়। শেরশাহ কর্তৃক সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গীরের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ তাদের মধ্যে বণ্টন করুন। সুজাত খান লোভের বশবর্তী হয়ে মন্ত্রীদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। একথা জানতে পেরে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে দু'হাজার খ্যাতিমান লোক পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সুজাত খান যদি লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তারা শেরশাহের নিকট এ অন্যায়ের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। কেননা তারা জানতেন যে, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব বা অন্যকোন দুর্বলতাকে শেরশাহ কখনো প্রশ্রয় দেন না। তারা সকলেই একবাক্যে সুজাত খান ও তার মন্ত্রীদের এরূপ অন্যায় কার্যের নিন্দা জ্ঞাপন করল। পার্থিব কোন লোভের বশে কিংবা অন্য কোন অবস্থাতেই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার শপথ গ্রহণ করল। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তারা সুজাত খানের সৈন্য দল থেকে পৃথক হয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলেন। তৎপর সুজাত খানের নিকট একজন বিশ্বস্ত লোক মারফত বলে পাঠালেন,---'শেরশাহ আমাদের জন্য যে পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ করেছেন আপনার মন্ত্রিগণ তার পুরোপুরি অংশ আমাদেরকে দিচ্ছেন না। এ কাজ সম্পূর্ণ আইন বিরোধী। আমীরদের উচিত পারিতোষিক ও মাসিক বেতন দিয়ে দরিদ্র সৈনিকদের অবস্থার পরিবর্তন করা, যাতে তারা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়তে পারে। কিন্তু আপনি যদি তৎপরিবর্তে আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে আমাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও শত্রুতার সৃষ্টি হবে। ফলে আপনার সৈন্যবাহিনীতে গোলযোগ ও অনৈক্যের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। আপনার মন্ত্রি-গণকেও অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

সুজাত খান সৈনিকদের অভিযোগ শ্রবণ করার পর মন্ত্রীদের নিকট এ সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করলেন। মন্ত্রিগণ উত্তর দিলেন,—"দু'হাজার অশ্বারোহী আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছে। আপনি দশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক আপনি যদি দু'হাজার লোকের দাবি ষোল আনা পূর্ণ করেন—তাহলে অন্যরা ভাববে যে, শের খানের ভয়েই আপনি দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে সমগ্র প্রদেশে শাসন দৌর্বল্য প্রকাশ পাবে, বিশৃঙ্খলা শুরু হবে এবং আপনার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়বে। এখন তাদের নিকট কঠোর উত্তর প্রদান করাই উচিত। সুতরাং পরবর্তীকালে আর কেউ আপনার অবাধ্য হওয়ার প্রয়াস পাবে না।" লোভের কালিমায় সুজাত খানের দূরদৃষ্টি আঁখি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি শেরশাহের ন্যায়নীতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের কুপরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। সৈন্যগণ সুজাত খানের রূঢ় উত্তর পেয়ে পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। কেউ কেউ ন্যায়পরায়ণ শেরশাহের নিকট বিষয়টি পেশ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শেরশাহের স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত প্রজ্ঞাশীল কয়েকজন সৈনিক সহযোগীদেরকে বলল,—"শের শাহের নিকট আমাদের সরাসরি যাওয়া উচিত হবে না। কারণ তিনি সুজাত

খানের সঙ্গেই আমাদেরকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর বিনা অনুমতিতে এ স্থান ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। আমাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করার জন্য চলুন আমরা উৎপীড়িতের রক্ষাকারী শেরশাহের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করি। সম্রাটের নির্দেশ অনুসারেই আমরা কাজ করব। ইত্যবসরে সম্রাটের যদি কোন প্রয়োজনীয় কাজের উদ্ভব হয় তাহলে আমরা অন্যদের চাইতে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে উক্ত কাজ সমাধাকল্পে যত্নশীল হব।"

পরিশেষে সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তারা একটি পত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করে সেটা শের খানের নিকট প্রেরণ করলেন। প্রতিনিধি রাজধানীতে পৌঁছার পূর্বেই দু'হাজার সৈন্যের সাথে সুজাত খানের এ বিবাদের খবর গুপ্তচর মারফত শের খানের গোচরীভূত হল—এ সংবাদ শুনে শেরশাহ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লেন এবং সুজাত খানের প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "সুজাত খানকে বলে দিন : আপনি একদা দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করতেন। আমিই (শেরশাহ) আপনাকে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করেছি এবং আপনার চেয়ে যোগ্যতর আফগানকে আপনার অধীনে নিয়োজিত করেছি। আপনি আপনার সরকারের রাজস্বে সন্তুষ্ট না হয়ে সৈন্যদের অধিকারের উপর লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আপনি লোকলজ্জা ও আল্লাহ্‌ভীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করছেন। আমীর ও সাধারণ সৈনিকদের অধিকার সুনির্দিষ্ট করে আমি যে আইন জারি করেছি আপনি তাও লঙ্ঘন করেছেন। দলপতিকে অবশ্যই সৈনিকের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। আপনি কি এ অনুজ্ঞাও বিস্মৃত হয়েছেন? আমার আশ্রিত ব্যক্তি না হলে আমি আপনার গাত্রচর্ম তুলে নিতাম। কিন্তু প্রথম অপরাধ হিসেবে আপনাকে ক্ষমা করা গেল। অসন্তুষ্ট সৈনিকদের প্রতিনিধি আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট করুন। কিন্তু যদি তার অন্যথা হয় এবং সৈনিকদের প্রতিনিধি আমার নিকট এসে অভিযোগ করে, তাহলে আপনার জায়গীর বাজেয়াফত করব এবং আপনাকে বন্দী করে কঠোরতম সাজা প্রদান করব। প্রভুর নির্দেশ লঙ্ঘন করা আমীরদের উচিত নয়। কেননা তা প্রভুর সম্মান, গৌরব ও কর্তৃত্বের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

প্রতিনিধি মারফত পত্র পেয়ে সুজাত খান অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। উজীরদের ডেকে তিনি বললেন, 'আপনাদের পরামর্শ আমার জন্য অসম্মান ও

দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কিভাবে সম্রাটকে এ মুখ দেখাব? সুজাত খান স্বয়ং দু'হাজার সৈনিকের তাঁবুতে গমন করে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ভবিষ্যতে তাদের কোন ক্ষতি না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। নানাবিধ পারিতোষিক ও উপহার প্রদানপূর্বক সৈনিকদেরকে পরিতুষ্ট করে তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। সৈনিকদের প্রতিনিধি যখন মধ্যপথ থেকে ফিরে এসে সুজাত খানের সম্মুখে হাযির হলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। দীন-দরিদ্রের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিলিয়ে দিলেন এবং প্রতিনিধিকে অশ্ব ও রাজকীয় পোশাক প্রদান করলেন। শেরশাহ সমগ্র আফগান জাতির উপর নিজের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে এ প্রভাব কখনো শিথিল হত না। দৈহিক শাস্তি কিংবা পদচ্যুতির ভয়ে কেউ তাঁর বিধি-বিধান লংঘন করতে সাহসী হত না। নিজ পুত্র, উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী কিংবা নিকটতম আত্মীয়ও যদি শেরশাহের বিরাগভাজন হতেন, তাহলে তাকে কারাবরণ এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। সকলেই আফগান জাতির স্বার্থের খাতিরে বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন বিসর্জন দিয়ে শের খানের অলংঘনীয় ফরমান মেনে চলতেন।

আমি (গ্রন্থকার) শুনেছি যে, শেরশাহের রাজত্বকালে আজম হুমায়ুন নিয়াজী পাঞ্জাব ও মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে ছিল ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী। শেরশাহের অন্যকোন আমীরের এত বিরাট সৈন্য বাহিনী ছিল না। নিয়াজীর অধিকারভুক্ত রোহ জেলা শাসনের জন্য শেরশাহ ভাগ্নে মুবারিজ খানকে প্রেরণ করেন। সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে নির্মিত মাটির দুর্গটি মুবারিজ খানকে প্রদান করার জন্য তিনি চম্বল দলপতি খিজর খান চম্বলিকে নির্দেশ দান করেন। মুবারিজ খান উক্ত দুর্গে বসবাস করতেন। চম্বলের অধিবাসিগণ অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সর্বদা মুবারিজ খানের নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাদাদ চম্বলের কন্যা সমগ্র গোত্রের মধ্যে রূপ-লাবণ্যে ছিলেন অনন্যা। তার রূপমাধুরীর খ্যাতি শ্রবণ করার পর মুবারিজ খান বিনা দর্শনেই উক্ত ললনার প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি আহার-নিদ্রা ভুলে গেলেন। ক্ষমতার গর্বে স্ফীত মুবারিজ খান রোহিল্লাবাসী ও আফগানদের গোষ্ঠীগত প্রথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে গোপনে আল্লাদাদের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং তাঁর (আল্লাদাদ) কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন। আল্লাদাদ উত্তর প্রদান করলেন :

"জাঁহাপনার পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অপরিসীম। আপনি বহু সন্তানের পিতা। বহু সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী, স্ত্রী ও ক্রীতদাসী হিসাবে আপনার হেরেমের শোভা বর্ধন করছে। তাছাড়া হিন্দুস্থানেই লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে আপনি প্রভূত জ্ঞান-গরিমা ও শিষ্টাচার অর্জন করেছেন। আমার সন্তানগণ রোহের রীতিনীতি অনুযায়ী মানুষ হয়েছে। সুতরাং এতখানি আকাশ-পাতাল ব্যবধানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আমার মতে অসঙ্গত।" এ উত্তরে মুবারিজ খান রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি চম্বলবাসীদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, নির্যাতনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাদাদের কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করবেন। শেরশাহের ভয়ে শত নির্যাতন সত্ত্বেও চম্বলবাসীরা নীরব রইল। কিন্তু অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ফরিদ, ইদ্রিস ও নিজাম নামক আল্লাদাদের তিন জারয ভ্রাতা মুবারিজ খানকে বললেন, 'আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ের কতিপয় কন্যা রয়েছে। আপনার ইচ্ছানুযায়ী যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারেন। তবুও চম্বলবাসীকে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিন।' মুবারিজ খান উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের কন্যাকে চাইনে। আল্লাদাদের কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর।' ভ্রাতৃত্রয় অনুধাবন করতে পারল যে, মুবারিজ খান এমন বস্তু কামনা করছে যা তার আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং তারা বিনা দ্বিধায় বলল, 'আপনাদের ও আমাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু এ বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে এক খাঁটি রক্তের সঙ্গে অপর খাঁটি রক্তের এবং এক দাস বংশের সঙ্গে অপর দাস বংশের। বংশগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আপনার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত বিবাদের নিরসন ঘটানোর জন্যই আপনার সঙ্গে আমাদের কন্যা বিবাহ দিতে চেয়েছিলাম। অধিকন্তু আমরা তিনভাই ক্রীতদাসীর গর্ভেই জন্মলাভ করেছি, সেদিক দিয়ে আমাদের ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু আপনি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এজন্য আমরা অতীব দুঃখিত। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও আফগান প্রথার বিরুদ্ধ কাজ করবেন না। আল্লাদাদ খাঁটি বংশে জন্মলাভ করেছেন। তিনি উৎপীড়ন ও নির্যাতনের ভয়ে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাযী হবেন না। সুতরাং নিষ্ফল আশা পরিত্যাগ করুন। এসকল কথা শুনে, ক্ষমতাগর্বী দাম্ভিক মুবারিজ খানের ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তিনি

রাগ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে চম্বলবাসীদের উপর নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালাতে লাগলেন। বিনাদোষে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করলেন। অনেক লোক অহেতুক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। মুবারিজ খেরুর কন্যাকে ধরে এনে গৃহে আবদ্ধ করে রাখলেন। খেরু ছিল আল্লাদাদের আশ্রিত ব্যক্তি। তাকে চম্বলে রাজ্যের সাহ্না হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

চম্বলের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সমবেতভাবে মুবারিজ খানের কাছে গিয়ে জানালেন,—'আপনার ও আমাদের পুরনারীদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। খেরুর কন্যাকে মুক্তি দান করে আমাদের মা-বোনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। চম্বল অধিবাসীদের বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কেননা তাঁর নিয়তি চক্র তখন ক্রান্তিলগ্নে উপনীত।

নিরাশ চম্বলবাসী তখন বলল—'আপনার জন্ম হিন্দুস্থানে। আফগানদের চরিত্র সম্বন্ধে তাই আপনি অনভিজ্ঞ। চড়ুই পাখি কোনদিন বাজপাখীর উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। সম্রাটের খাতিরে আপনাকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন আমাদেরকে রেহাই দিন। আর কত অত্যাচার করবেন, ঐ অবলা নারীকে মুক্ত করুন।' মুবারিজ রাগতস্বরে বললেন, "তোমরা তোমাদের আশ্রিতের সম্মান রক্ষার কথা বলছ। কিন্তু অচিরেই দেখতে পাবে আল্লাদাদের মেয়েকে বলপূর্বক গৃহ হতে হরণ করে নিয়ে এসেছি।" চম্বল দলপতিগণও রাগতকণ্ঠে বললেন, "আশা করি জীবনের মায়া ত্যাগ করে নিজের আওতার বাইরে পা বাড়াবেন না। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করলে আপনাকে হত্যা করতে আমরা কুন্ঠিত হবো না। আমরা জানি আপনাকে হত্যা করার দায়ে আমাদের দলপতিগণের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু তবুও আপনাকে হত্যা করতে আমাদের দ্বিধা নেই।" মুবারিজ খান চম্বল দলপতিদের এ স্পর্ধিত উত্তর শুনে অপমান বোধ করলেন। এ অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তাঁদের প্রহার করে কক্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি হিন্দুস্থানী দ্বার রক্ষককে নির্দেশ দিলেন। প্রহার করার জন্য দ্বার রক্ষকগণ লাঠি উদ্যত করলে এক বিষম হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। উৎপীড়িত ও ক্রোধান্ধ বীর চম্বলবাসী চক্ষের পলকে মুবারিজ খান ও তাঁর অধিকাংশ অনুচরকে হত্যা করল।

এ সংবাদ শুনে শেরশাহ আজম হুমায়ুনের নিকট লিখলেন, 'শূরগণ আফগান জাতির মধ্যে সবচাইতে শান্তিপ্রিয় গোত্র। প্রতিটি আফগান যদি এক-একজন শূরকে হত্যা করে তাহলে তাদের একজনও পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না। চম্বলবাসী আপনারই সমগোত্রীয়। আপনি তাদের এমনভাবে দমন করুন যাতে তারা আর কখনো অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত না হয় এবং ভবিষ্যতে কোন গভর্নরকে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন না করে।' এ আদেশনামা পাওয়ার পর আজম হুমায়ুন চম্বলদের দমন করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেন। আজম হুমায়ুনের আগমন সংবাদ পেয়ে চম্বলগণ দেশত্যাগ করে সপরিবারে কাবুল যাওয়ার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তাদের কাবুল যাওয়ার দুরভিসন্ধি জানতে পেরে হুমায়ুন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক পরামর্শ সভায় তিনি অনুচরদের বললেন, চম্বলবাসিগণ আমার গোত্রীয় ভ্রাতা, সংখ্যায় তারা বিপুল। আমরা তাদেরকে জোরপূর্বক আটক করতে পারব না। তারা যদি কাবুলে চলে যায় তাহলে শেরশাহ ভাববেন যে, আমার গাফিলতি এবং পরোক্ষ সম্মতির দরুন তারা পালাতে সক্ষম হয়েছে। অতএব কৌশলে তাদের আটকাতেই হবে। তিনি চম্বলবাসীদের নিকট রাজদূত মারফত জানালেন,—'আমি এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তোমরা নির্দোষ। মুবারিজ খানের হাতে তোমরা অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করেছ। আমি তোমাদেরকে শের খানের নিকট প্রেরণ করব; তোমাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব। আফগান প্রথানুযায়ী 'নিয়াজি'গণ তাদের কতিপয় কন্যাকে শূরদের নিকট বিবাহ দিবেন অথবা শেরশাহ তোমাদের দু'-একজন দলপতিকে হত্যা করবেন। সমগ্র গোত্রের অন্য দেশে নির্বাসনে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। চম্বলরা উত্তরে লিখলেন, 'আমরা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছি। শূরগণ যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে আমরাও প্রাণপণে লড়ে যাব। 'নিয়াজি'গণ কিভাবে যুদ্ধ করে নির্বাসনকে বরণ করেছে তার কাহিনী বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবে'। আপনি যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেক্ষেত্রেও নিয়াজিগণ মারা পড়বে। দ্বিমুখী আক্রমণের শিকার হবে তারা। আমরা বিতাড়িত হলে তখনও আপনাকে বইতে হবে অপমানের গ্লানি। কেননা বিতাড়িত ব্যক্তিরা আপনারই সমগোত্রীয় ভাই হওয়া সত্ত্বেও আপনার করুণা বা সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু আপনি যদি আমাদের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার আশ্বাস দেন তবে আমরা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করব।' আজম হুমায়ুন উত্তর দিলেন, 'আত্মীয়দের প্রতি আমার কি কোন টান নেই যে, আমি তাদের নির্যাতন করব।' অতঃপর হুমায়ুন চম্বলদের নিকট বার বার তাদের রক্ষার ব্যাপারে ওয়াদা করেন। আশ্বস্ত চম্বলরা সপরিবারে হুমায়ুনের নিকট আগমন করলেন। হুমায়ুন দেখতে পেলেন যে, তাঁর প্রতারণা ফলবতী হয়েছে। তিনি চম্বলদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে নয় শ' লোককে হত্যা করলেন। হত্যা করার সময় কয়েকজন নিয়াজী তাদের চম্বলবাসী বন্ধুদেরকে বললেন, 'আমরা তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। পালিয়ে যাও।' কিন্তু চম্বলবাসিগণ আফগান জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বলল, 'অসম্মানজনক উপায়ে বেঁচে থাকার চাইতে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। কেননা প্রবাদ আছে,—'সমগ্র গোত্রের সকলে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করা একটা পবিত্র ভোজস্বরূপ।' আজম হুমায়ুন অধিকাংশ চম্বলবাসীকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী-পরিজনকে শেরশাহের নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্তু শেরশাহ হুমায়ুনের এ নৃশংস কাজকে সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, "আফগানদের মধ্যে আর কখনো এরূপ লজ্জাকর ব্যাপার সংঘটিত হয়নি। কিন্তু হুমায়ুন সম্রাটের ভয়েই স্বগোত্রীয় এতগুলো লোককে হত্যা করেছেন। সম্রাটের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যবশতই তিনি নিষ্প্রয়োজনে স্বগোত্রীয় লোকের বক্ষরক্তে নিজহস্ত কলংকিত করেছেন।" তিনি হুমায়ুনকে পাঞ্জাবের শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না, কারণ শেরশাহ এর আগেই পরলোকগমন করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পরও হুমায়ুন প্রভৃত আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যথাযোগ্য স্থানে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

শেরশাহের সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়নি। কিংবা কেউ টুঁ-শব্দ করার স্পর্ধা দেখায়নি। তার সাম্রাজ্যরূপ বিশাল কাননে যন্ত্রণা উৎপাদক কণ্টকও জন্মেনি। আমীর, সৈনিক, চোর, ডাকাত, কেউ অসাধু পন্থা অবলম্বন করে কিংবা জোর-জবরদস্তি চালিয়ে পরদ্রব্য আত্মসাত করতে পারত না। রাজ্যের কোথাও চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হত না। পথচারিগণ নিরুদ্বেগে রাজপথে চলাচল করতো। মরুভূমির মধ্যস্থলে রাতযাপন করলেও তাদের কোন

ভয়ের কারণ ছিল না। জনবসতিপূর্ণ স্থান কিংবা জনহীন প্রান্তরে যেখানে ইচ্ছা তারা নির্ভয়ে তাঁবু স্থাপন করতে পারত। সহায়-সম্পদ খোলা জায়গায় রেখে এবং খচ্চরকে চারণ ভূমিতে ছেড়ে দিয়ে নিজ গৃহের ন্যায় পরম শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে রাতযাপন করা যেত। জমিদারগণ নিজে দায়ী হয়ে শাস্তি ভোগ করার ভয়ে নিজ এলাকায় যাতে কোনরূপ অঘটন না ঘটতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। শেরশাহের রাজত্বকালে একজন অক্ষম বৃদ্ধা ঝুড়ি ভর্তি স্বর্ণ মাথায় নিয়ে যে কোন স্থানে নির্ভয়ে পথ চলতে পারত। শেরশাহের শাস্তির ভয়ে কোন চোর-ডাকাত অনুরূপ বৃদ্ধার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সাহসী হত না। 'বিশ্বের উপর সত্য ও ন্যায়ের এরূপ সুশীতল ছায়া নেমে এসেছিল যে, দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়নের ভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল।' এই সুবর্ণ যুগে আফগানদের স্বভাবজাত বিবাদ-বিসম্বাদ ও সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যে এক পরম শান্তি নেমে এসেছিল। জ্ঞান, প্রজ্ঞায় ও বীরত্বে শেরশাহ ছিলেন দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। অতি অল্প কালেই তিনি সাম্রাজ্য শাসন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি সুশাসনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের প্রতিটি স্তরে অনাবিল সুখ-শান্তি ও আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ন্যায়বানদের প্রতিভূ।

IFB—86-87—P/2714—3250—1-9-1986